চরিত রত্নাবলী।

প্রথম ভাগ।

"সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসিগণে।"

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত।

নং ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

—:o:—

CALCUTTA
PRINTED BY K. C. DATTA AT THE B. M. PRESS
211, CORNWALLIS STREET.
1894

মূল্য ।০ আনা।

সূচীপত্র।

চরিত রত্নাবলী।

প্রথম ভাগ।

"সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসিগণে।"

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত।

চরিত রত্নাবলী।

প্রথম ভাগ।

"সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে স্থধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসিগণে।"

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত।
নং ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

—:o:—

CALCUTTA
PRINTED BY K. C. DATTA AT THE B. M. PRESS
211, CORNWALLIS STREET.
1894

মূল্য ।৹ আনা।

সূচীপত্র।

চরিত রত্নাবলী।

প্রথম ভাগ।

করমেতি বাই।

খণ্ডেল গ্রামে পরশু নামে একজন রাজ-পুরোহিত বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম করমেতি বাই। করমেতি অতি শৈশব হইতেই হরিপ্রেমে অনুরাগিনী ছিলেন। হরি-গুণগান, হরি-কথাশ্রবণ, হরি-রসালাপই তাঁহার জীবনমন্ত্র ব্রত ছিল। ভক্ত ধ্রুব ও প্রহ্লাদের যেমন বাল্যকালেই ভগবানের দিকে মন প্রাণ প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, করমেতিও সেইরূপ হরিভক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য বালিকাদিগের ন্যায় ভোগ বিলাস এবং অসার কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করিতেন না। তিনি নিয়তই ধর্ম্ম চিন্তা করিতেন, সাধনা তাঁহার আজীবন সহচরী ছিল।

সামাজিক নিয়মানুসারে বাল্যকালেই করমেতির বিবাহ হইল। কিন্তু করমেতির প্রাণ যে জন্য লালায়িত, তিনি দিবা-রাত্র যাহা চিন্তা করেন, যাহা অন্বেষণ করেন, তাঁহার স্বামী সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। করমেতির স্বামী ধর্ম্ম-বিশ্বাস-

বিহীন, বিষয়াসক্ত, ঘোর সাংসারিক। দুই জনের জীবন স্রোত দুই দিকে প্রবাহিত, সুতরাং সম্মিলনের আশা কোথায়? একজন চাহেন স্বর্গ, অদৃশ্য সচ্চিদানন্দময় রাজ্য, ভগবৎপ্রেম; অপর জন চাহেন সংসার-সম্মান ও ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ। সুতরাং স্বামী, করমেতির ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল হইলেন।

মূর্ত্তিমতী ভক্তির প্রতিকৃতি করমেতি চিদানন্দময় হরিরূপ-সাগরে ডুবিয়াছেন; বৃক্ষ লতা পাতা, ফুল ফলে শ্রীহরির অরূপ রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছেন; চতুর্দ্দিকেই তাঁহার প্রাণদেবতা শ্রীহরি মূর্ত্তিমান্। তিনি যোগ-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ত্রিভুবন শ্রীহরিময় দর্শন করিতেছেন। অকস্মাৎ তাঁহার এই যোগ সাধনে বিঘ্ন ঘটিল। করমেতিকে স্বামীগৃহে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরবাড়ী হইতে লোক উপস্থিত হইল। করমেতি বিষম বিপদে পতিতা হইলেন। যাঁহার চিত্ত পার্থিব সুখভোগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত বাহিরের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া, অন্তরের অন্তরতম স্থানে আনন্দময়ের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যাকুল হইয়াছে, বিষয়ী, ধর্ম্মবিহীন স্বামীর সংসর্গে বাস করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। করমেতি ভাবিতে লাগিলেন।

"তথায় যাইলে মোর কুসঙ্গ সংস্কারে।
মন বুদ্ধি হরি লয় বিষয় তস্করে॥
হরিভক্তি, পরশরতন হারাইব।
হায় হায় কি দশা হইবে কি করিব॥"

ভক্ত মাল।

তিনি অস্থির হইলেন। শ্বশুরবাড়ী গেলে সাধন ভজন করিতে পারিবেন না; প্রত্যুত কুসঙ্গে মিশিয়া হরিভক্তি হারাইবেন, ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এরূপ স্বামীর সহিত বাস করা তিনি বিষতুল্য মনে করিলেন। বাস্তবিক পৃথিবীর লোকে যাহাতে সুখানুভব করে, অনেক স্থলেই ঈশ্বরপ্রেমিকগণ তাহা নরকের আলয় বলিয়া পরিত্যাগ করেন। করমেতি স্বামী গৃহে গমন করিলে ধনজনে যথেষ্ট সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতে পারেন; স্বামীর গৃহ পার্থিব সম্পদে পরিপূর্ণ; অপর দিকে স্বামীও করমেতির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; পিতা মাতার অনুরোধ, স্বামী কুলের আগ্রহ, নব যৌবনের ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা, বিষয় ভোগ-তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসার সুখের সকল কাম্য বস্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত। এই অবস্থা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভগবানের চরণে অর্পণ করিতে কয়জনে সমর্থ হয়? কিন্তু করমেতি ঈশ্বর-কৃপা-সিদ্ধ, তাঁহার প্রকৃতিই ভক্তিময়ী। সংসারের দূরে অবস্থিতি করিয়া অনন্যমনে দিবারাত্র হরিধ্যানে নিমগ্ন থাকিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। তিনি বিষয়-কালকূট কিরূপে পান করিবেন?

করমেতি সংকল্প করিলেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন, জীবন যৌবন শ্রীহরির সেবায় নিয়োজিত রাখিবেন। হরি তাঁহার প্রাণপতি, জীবন সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে লইয়াই তিনি সংসার করিবেন। করমেতি দেখিলেন, গৃহে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সাধন ভজন করিবার উপায় নাই; পিতা মাতা, স্বামী সকলেই সাধনের অন্তরায়। ইহাদের সঙ্গে বাস করিয়া কখনও তিনি

জীবনব্যাপী সাধনে রত থাকিতে পারিবেন না, বরং অভক্ত বিষয়ীর সংসর্গে তাঁহার মন কলুষিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করিবেন। বাস্তবিক যাঁহাদের জীবন স্বভাবতই ধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবনের নির্জ্জন বন, পবিত্র বায়ুসেবিত সুস্নিগ্ধ যমুনা পুলিন, ফুল ফল লতা পাতায় শোভিত মনোহর নিকুঞ্জবন, অতি উপাদেয় স্থান। করমেতি বিশেষ চিন্তা ও প্রার্থনা করিয়া বৃন্দাবন যাত্রাই স্থির করিলেন। কাহাকেও এ সাধুসংকল্প জানাইলেন না।

করমেতি গৃহ হইতে বাহির হইবেন। অর্দ্ধরজনী অতীত হইয়াছে। ভিতর বাড়ী এবং বাহির বাড়ীতে সকলে সুষুপ্ত। করমেতি শ্রীহরি স্মরণ করিয়া গৃহদ্বার খুলিলেন। বাহিরে কাহারও সাড়া শব্দ নাই। ইহাই উপযুক্ত সময় ভাবিয়া তিনি ধীর-পাদ-বিক্ষেপে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। করমেতি যুবতী, ভদ্রকন্যা, আশৈশব অন্তঃপুরে প্রতিপালিতা, এই গভীর নিশীথে কোথায় যাইতেছেন? তাঁহার কি জাতি কুলের ভয় নাই? কোথায় যাইবেন? সুদূর বৃন্দাবনে। রাস্তা ঘাট চিনেন না, অপরিচিত, অজ্ঞাতপথে একাকিনী কুলবতী রমণী দেশান্তরে যাইবেন! যে কার্য্যে বীরধর্ম্মী যুবকের প্রাণ শঙ্কিত হয়, রমণী সেই কার্য্যে প্রবৃত্তা। করমেতি, এই বীর-হৃদয়-জাত সাহস কোথায় পাইলেন? যিনি গৃহ হইতে পদব্রজে গ্রামান্তরে গমন করেন নাই, তাঁহার আজ বৃন্দাবন যাত্রা! করমেতি প্রাণের মধ্যে কি এক মধুর ধ্বনি শুনিয়াছেন, গৃহে তাহার মন বসিতেছে না, ভয় বিঘ্ন আর তাঁহাকে

নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। কুরঙ্গিনী যেমন সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে বংশীধ্বনির অনুসরণ করে, সেইরূপ করমেতিও প্রাণদেবতার আহ্বানে বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছেন। ঈশ্বর প্রেমিক কবি, অমৃতময়ী ভাষায় ঈশ্বর আহ্বানে ব্যাকুলপ্রাণ সাধকের অবস্থা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—

"এমন মধুর আহ্বান, মৃতদেহে জাগেরে প্রাণ,
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে ;
(মধুর ডাক শুনে রে) (পরাণ আকুল করে)
কাটে মোহ নিদ্রার স্বপন রে ;
সে বাণী পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে,
সঁপিবারে জীবন যৌবন রে ;
(বিভু প্রেমানলে রে) (অনলে পতঙ্গ যেমন)
বিষয় বাসনা ফেলি, সুখ স্বার্থ পায়ে ঠেলি,
ধায় তারা মত্তের মতন রে ;
(বিভু প্রেমানলে রে) (অনলে পতঙ্গ যেমন)"

করমেতি প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন, প্রার্থনা করিলেন, তৎপর পিতা মাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিরূপে বাহিরে যাই-বেন ? সকল দ্বার রুদ্ধ। বাড়ীর চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা। তিনি অনন্যোপায় হইয়া প্রাচীরের উপরে উঠিয়া লম্ফ দিয়া নিম্নে পতিত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়াতেও তিনি কোনও রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন না। যিনি ঈশ্বরের ডাক শুনিয়া চলেন, ভক্তবৎসল

ভগবান তাঁহাকে সকল অবস্থাতেই রক্ষা করেন। কিন্তু হরিগতপ্রাণা করমেতির শরীরের প্রতি দৃষ্টি নাই। শরীরে আঘাত লাগিবে কিম্বা অন্ধকার রাত্রে বন পথে চলিতে সর্পে দংশন করিবে বা বন্য জন্তু আক্রমণ করিবে, এ সকল বাহ্য চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে বিন্দু মাত্রও উদয় হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুল প্রাণে ছুটিলেন।

রজনী প্রভাতে পুরোহিত দম্পতি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের স্নেহের দুহিতা করমেতি গৃহে নাই। পুরোহিত ত্বরায় রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "মহারাজ, আমার কন্যা করমেতি নিরুদ্দেশ হইয়াছে, অবিলম্বে অনুচর পাঠাইয়া তাহার অনুসন্ধান করুন, নতুবা আমার জাতি কুল সকলই নষ্ট হইবে।" রাজা তৎক্ষণাৎ পুরোহিতপুত্রীর উদ্দেশে চারিদিকে সশস্ত্রসৈনিক প্রেরণ করিলেন।

করমেতি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত রজনী গমন করিয়া প্রভাত সময়ে এক বিস্তৃত প্রান্তরে উপনীত হইলেন এবং সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে একদিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে উষ্ণীষধারী অশ্বারোহী দেখা যাইতেছে। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্যই রাজবাড়ী হইতে ঐ সকল লোক আসিতেছে। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া করযোড়ে ইষ্ট দেবতা হরিকে ডাকিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানকারীদিগের হস্তে পতিত হইলে, তাঁহার বৃন্দাবন যাত্রা বিফল হইবে, জীবনের সংকল্প

ভঙ্গ হইবে, কুসংসর্গে বাস করিয়া হরিভক্তিবিহীনা হইবেন। তিনি এসকল চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটা মৃত উষ্ট্র পতিত রহিয়াছে। তিনি অতি দ্রুত বেগে সেই মৃত উষ্ট্রের নিকটে গেলেন। দেখিলেন, উটের ভিতরকার মাংস পচিয়া গিয়াছে। তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি সেই মৃত উষ্ট্রের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কমনীয় শরীর পচা মাংসের ক্লেদে আবৃত হইল। তিনি উটের ভিতরে এই ভাবে রহিলেন যে, দূর হইতে তন্মধ্যে মানুষ আছে বলিয়া কেহ অনুভব না করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে গলিত মাংসের সহিত শরীর মিশাইতে হইল। যে দুর্গন্ধ নাশিকায় প্রবিষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া পথিকগণ দশ হস্ত সরিয়া যায়, সেই দুর্গন্ধের ভিতরে অবলীলাক্রমে তিনি বসিয়া রহিলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাতর প্রাণে শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি সম্যক্ প্রকারে মনকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর জগতে প্রবিষ্ট করিলেন। তিনি বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ করিলেন, সুতরাং বর্ত্তমান ক্লেশকর অবস্থা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শও করিতে পারিল না।

অনুসন্ধানকারিগণ করমেতিকে দেখিতে না পাইয়া প্রতিগমন করিল। কথিত আছে, করমেতি তিন দিবস সেই মৃত উষ্ট্রের ভিতরে বাস করিয়াছিলেন। এই তিন দিন আহার নিদ্রা হয় নাই, কেবল চিদানন্দময় হরির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তৎপর তিনি নিরাপদ অবস্থায় উষ্ট্রগর্ত্ত হইতে বাহির

হইয়া পবিত্রসলিলা ভাগিরথীতে অবগাহন করিয়া পুনরায় বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

করমেতির গৃহত্যাগে পিতা পরশু, অস্থিরচিত্তে তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। শ্রুতিপরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, করমেতি ভিকারিণীর বেশে বৃন্দাবনে গিয়াছেন। পরশুও বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় নাগরিকগণের নিকট করমেতির অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার সংবাদ বলিতে পারিল না। অবশেষে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পিতা জানিতেন, নির্জন স্থানে চিন্তা ও ধ্যানে নিবিষ্ট থাকাই করমেতির প্রকৃতি। তিনি নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও যখন করমেতিকে দেখিতে পাইলেন না, তখন বন মধ্যস্থ এক উচ্চ বৃক্ষশাখায় উঠিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বহুদূরে একজন রমণী একাকিনী এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা আছেন। তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া রমণীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি যাঁহাকে অনুসন্ধানে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ইনিই তাঁহার সেই প্রিয়তমা কন্যা করমেতি। পরশু কন্যাকে তদবস্থায়, ধ্যানোপবিষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার সংসারগত, অহঙ্কৃত, কঠোর প্রাণ ধর্ম্মের কোমল স্পর্শে দ্রবীভূত হইল তিনি ভাবিলেন, করমেতি তাঁহার কন্যা নহেন, তিনি যোগনিমগ্না মূর্ত্তিমতী বনদেবী। "আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন দেবকন্যা আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আমার মাতৃরূপা—আমার পরিত্রাণের সহায়।" এই ভাবিয়া বৃদ্ধ পিতা, ভক্তি গদ গদ চিত্তে করমেতির পাদমূলে পতিত হইলেন।

করমেতি নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা চরণে পতিত। তিনি লজ্জিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে পিতাকে নমস্কার করিলেন।

তৎপর পিতা ও কন্যায় অনেক বাক্যালাপ হইল। পিতা তাঁহাকে স্বদেশে যাইবার জন্য কত কথা বলিলেন; কিন্তু করমেতি স্বীকৃত হইলেন না;—

"শ্যামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে।
ডুবিয়াছে মন মম উঠিতে না পারে॥
দেহ লয়ে গিয়া মোর কি কাজ আছয়।
বৃথা কেন আগ্রহ করহ মহাশয়॥"

ভক্তমাল।

করমেতি গৃহে ফিরিলেন না। তিনি বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে, যমুনার সুশ্যামল পুলিনে, নিবিড় অরণ্যে, বৃক্ষমূলে যোগসাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযম, বৈরাগ্য, ভগবানের জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা এবং যোগচর্য্যায় করমেতির জীবন আদর্শ স্থানীয়। বৈষ্ণব সমাজে কেন, সকল দেশের সকল সমাজেই এরূপ ঈশ্বরপ্রেমিকা রমণী সম্পূজিতা হইয়া থাকেন।

এগ্‌নিস্‌।

প্রাতঃস্মরণীয়া এগ্‌নিস্‌ পরম সতী ছিলেন। তাঁহার অমৃতময়ী জীবন-কাহিনী শ্রবণ করিলে প্রাণ মুগ্ধ হয়, অসার পার্থিব বাসনা ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়।

তিনি রোম নগরে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী অজ্ঞাত। তিনি অতুলনীয়া রূপবতী ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন যুবকগণ তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইতে লাগিল। কেহ কেহ পত্রাদি লিখিতে লাগিল, কেহ কেহ বা মধ্যবর্ত্তী দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। এমন কি তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া স্বয়ং রাজপুত্রও তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। এগ্নিস্ যখন দেখিলেন, বহুসংখ্যক যুবক তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, তখন তিনি সুস্পষ্টরূপে কহিলেন,—"আমি বিবাহ করিব না, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এমন একজনের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে যে, তাঁহাকে তোমরা দেখিতে পাইবে না। তিনি আমার স্বামী, সহচর, বন্ধু, আশ্রয়দাতা এবং অনন্তকালের সম্পদ। আমি তাঁহাকে মন প্রাণ, জীবন যৌবন সকলি অর্পণ করিয়াছি। বিবাহের জন্য আমাকে কেহ বিরক্ত করিও না।"

এগ্নিসের এই কথা শুনিয়া যুবকদল ভয়ানক কুপিত হইল। প্রভু পরমেশ্বরকে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া কোনও রমণী যে আজীবন অবিবাহিতা থাকিতে পারেন, এই কথা কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা প্রত্যেকেই বিবিধ উপায়ে বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল।

তখন তাহারা সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে,—"এগ্‌নিস্‌ বিধর্ম্মী,সে ধর্ম্মসমাজের নিয়ম অগ্রাহ্য করিতেছে, সে পতিতা ও স্খলিত চরিত্রা।" ইহারপরে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণও যুবকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এগ্‌নিস্‌কে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা এগ্‌নিস্‌ কিছুতেই ভীতা হইলেন না। তিনি দুষ্টলোকদিগের কু-অভিসন্ধি দেখিয়া একদিন বলিলেন,—"লোকে আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, আমার পরম স্বামী আমাকে রক্ষা করিবেন।"

যুবকগণ যখন দেখিল, কিছুতেই এগ্‌নিসের মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে না, তখন তাহারা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্ব হইতে রাজকর্ম্মচারিগণ যুবকদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিল, এখন তাহাদের নিকটই বালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। বিচারক এগ্‌নিস্‌কে ডাকিয়া প্রথমতঃ বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু এগ্‌নিস্‌ প্রফুল্লবদনে স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন বিচারক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিতা রমণীদিগের গৃহে বাস করিতে আদেশ করিলেন এবং যুবকদিগকে বলিয়া দিলেন যে,—"এই রমণী চরিত্রবিহীনা, যে কেহ ইহার উপর অত্যাচার করিতে পারে।"

বিচারকের আদেশ সত্বরেই প্রতিপালিত হইল। এগ্‌নিস্‌ বারবণিতার গৃহে নীতা হইলেন। পবিত্রতা, ঈশ্বরপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা যাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তিনি পতিতা রমণীদিগের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই মহাশক্তি-রূপিণী রমণী কিছুতেই ভীতা হইলেন না। পশুপ্রকৃতি

যুবকগণ তাঁহার গৃহে গমন করিল। কিন্তু পবিত্রতার প্রতিকৃতি সেই রমণীর দেহে অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে কাহারও সাহস হইল না। স্বর্গীয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট পাশববল পরাভূত হইয়া গেল।

যুবকগণ, পাশববল প্রয়োগে অকৃতকার্য্য হইয়া এগ্‌নিসের প্রাণ বিনাশের সংকল্প করিল। এই অভিপ্রায়ে তাহারা রাজকর্ম্মচারীর নিকট পুনরায় অভিযোগ উপস্থিত করিল। রাজ-কর্ম্মচারী এগ্‌নিসের প্রাণ বিনাশের আজ্ঞা করিলেন। এগ্‌-নিস্ বিষণ্ণ হইলেন না। তাঁহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে, তাঁহার আত্মা জড়রাজ্য অতিক্রম করিয়া সচ্চিদানন্দ ধামে প্রবেশ করিয়াছে, প্রাণদণ্ডে তাঁহার ভয় কি? তিনি শান্তচিত্তে বধমঞ্চে আরোহণ করিলেন এবং প্রাণাধিক স্বামী পরমপ্রভু পর-মেশ্বরের অরূপ রূপসাগরে ডুবিয়া অসার ধূলী মাটির দেহ ত্যাগ করিলেন।

সঙ্ঘমিত্রা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইয়োরোপীয় রমণী প্রচারিকা দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে এক দল মুক্তিফৌজ নামে অভিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং নানা উপায়ে জনসমাজের সেবা করাই ইহাদের জীবনের ব্রত। বিলাতের অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য বংশের কন্যাগণ সমুদয় সাংসারিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা পরি-ত্যাগ করিয়া এই মহাসংকল্প সাধনের জন্য এ দেশে আসিয়াছেন। কেহ কেহ বা চির-কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া দেহ মন প্রাণ

ধর্ম্ম প্রচারার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই রমণী-প্রচারিকাদল এ দেশে আসিয়া ভারতীয় তপস্বিনীগণের ন্যায় গৈরিক বসন পরিধান করেন, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেই মৎস্যমাংসাহারী। মৎস্য মাংস ভিন্ন তাহাদের আহার সম্পন্ন হয় না। এই প্রচারিকা ভগিনীগণের অনেকেই নিরামিষ ভোজন করেন; শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদিগের অনেকেই কেবল ডাল ভাত খাইয়া জীবনধারণ করেন। ভারতবর্ষে রমণীগণের বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ আবৃত রাখা যেমন সামাজিক নীতি ও সভ্যতামূলক, বিলাতে রমণীগণের পদদ্বয় সম্পূর্ণ আবৃত রাখার নিয়মও সেইরূপ সভ্যতানুমোদিত। ইউরোপীয় সভ্য সমাজে রমণীর অনাবৃত পদ ভয়ানক ঘৃণা ও লজ্জার কারণ। ঐ সকল রমণী-প্রচারিকা এ দেশে আসিয়া তাঁহাদের সামাজিক প্রথা বর্জ্জন করিয়া এ দেশের মহিলাগণের ন্যায় পদদ্বয় অনাবৃত রাখেন, সামান্য পাদুকা পরিধান করেন মাত্র।

পতিতা রমণীদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য এই প্রচারিকাগণ কলিকাতায় একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল হতভাগিনী রমণীর আর ইহ জীবনে সাধুপথে, সাধু সহবাসে যাইবার উপায় ছিলনা, এই দেব কন্যাগণের যত্ন ও উদ্যোগে তাহারা দিন দিন নীতি ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছে। মাতা যেমন কন্যাকে লালন পালন ও শিক্ষা দান করেন, রমণী প্রচারিকাগণও সেই ভাবে পতিতা রমণীদিগকে পালন করিতেছেন ও শিক্ষা দিতেছেন। ইঁহাদের স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, বৈরাগ্য, সেবা, ধর্ম্মবিশ্বাস, পরহিতৈষণা এবং

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি দর্শন করিলে দেবতা জ্ঞানে ইঁহাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ হয়—শত কণ্ঠে ইহাঁদের প্রশংসাধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, যেন ব্যাধিগ্রস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত, পাপে তাপে অভিভূত, পতিত ভারত-বর্ষকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বর্গ হইতে এই দেবনারীগণ অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারিকার অভ্যুদয় এ দেশে নূতন ব্যাপার নহে। মহাত্মা মোক্ষমূলার বলেন "ভারতবর্ষ আধ্যাত্মি-কতার জন্মভূমি।" বাস্তবিক এ দেশে ধর্ম্মের উচ্চ নীতি, গভীর জ্ঞান এবং যোগ ভক্তি প্রভৃতি যেমন সাধকগণের প্রাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সেই স্বর্গীয় অমৃতরাশী জনসমাজে বিতরণ করিবার জন্যও তেমনি আয়োজন হইয়াছিল। রমণীদিগের মধ্যেও এই ভাব বহুলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি পরব্রহ্মের তত্ত্ব গভীররূপে আয়ত্ত করিতেন এবং প্রচার করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে শত শত বক্তৃতায় যাহা না হয়, তাঁহাদের এক একটি কথায় তদপেক্ষা অধিক ফল প্রসূত হইয়াছে। তাঁহারা মানবের চিন্তাসাগরে এমন তরঙ্গমালা তুলিয়া গিয়াছেন যে, তাহার ক্রীড়া এখনও চলিয়াছে। বৌদ্ধ-সমাজে, মহারাজ অশোকের সময়ে রমণী প্রচারিকাগণের দ্বারা অত্যদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সে সময়ের একজন পরম শ্রদ্ধেয়া প্রচারিকার অমৃতময়ী জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

অশোকের ন্যায় নরপতি ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম বয়সে ভয়ানক ক্রূর প্রকৃতির

লোক ছিলেন। তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেই সময় তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করে—একটী পুত্র আর একটী কন্যা। পুত্রের নাম মহেন্দ্র, কন্যাটির নাম সঙ্গমিত্রা। কালক্রমে অশোক ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচার করিবার জন্য ভিক্ষুদিগকে পাঠাইলেন। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল বন্যার ন্যায় পৃথিবীকে যেরূপ প্লাবিত করিয়াছিল, এরূপ আর কোনও ধর্ম্ম কোনও সময়ে করে নাই। সে সময়ে লক্ষাধিক বৌদ্ধ প্রচারক চীন, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-ভেরী চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হয়।

অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ছয় বৎসর পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহেন্দ্র ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। ইনি প্রচারার্থে বহু সংখ্যক ভিক্ষুসহ লঙ্কায় গমন করিলেন। তখন লঙ্কায় তিষ্য নামক নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। মহেন্দ্রের দেবোপম ধর্ম্মভাব দর্শন এবং অমৃতময়ী বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া লঙ্কার অধিপতি তিষ্য নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া রাণী অনুলা এবং তাঁহার সহচরীগণ বিশেষরূপে নবধর্ম্মের সাধন ভজন ও ভিক্ষুকী হইবার জন্য অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। মহেন্দ্র মহিলাগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "পাটলী পুত্র নগরে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী আমার ভগিনী সঙ্গমিত্রা ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। তিনি এখানে আসিয়া আপনাদিগকে

মহেন্দ্রের নিকট সঙ্ঘমিত্রার বিবরণ শুনিয়া রাজা এবং মহারাণী-প্রমুখ মহিলাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সঙ্ঘমিত্রাকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহারা মহেন্দ্রকে সানুনয় অনুরোধ করিলেন। উৎসাহী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহেন্দ্র ভগিনীকে আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাটলীপুত্র নগরে স্বীয় জনকের নিকট পত্রসহ লোক পাঠাইলেন। মহারাজ অশোক আনন্দচিত্তে মহেন্দ্রের আবেদন গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্যাকে লঙ্কায় গিয়া মহিলাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে পাটলীপুত্র হইতে সঙ্ঘমিত্রা লঙ্কায় গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে উত্তরা, হেমা, মালাগল্লা, অগ্নিমিত্রা, তপা, পর্ব্বতছিন্না, মল্লা, ধর্ম্মদাসী প্রভৃতি আরও অনেক প্রচারিকা গমন করেন। এই প্রচারিকাদল সিংহলে উপনীত হইয়া নবোৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য সমূহ মহিলাগণের প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধুর উপদেশে নারীগণ দলে দলে 'অনলে পতঙ্গের ন্যায়' নবধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ মানস চক্ষে অতীত ভারতের সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের রাজত্ব একবার দর্শন করুন। এখন যেমন ভারতে দলে দলে ইউরোপীয় রমণীগণ গৈরিকবসন পরিধান করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তদ্রূপ ঐ দেখুন ভারত, সিংহল, চীন, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে পীত বসনে আচ্ছাদিতা, ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধের যোগনিশান হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। এই সকল ধর্ম্মপ্রাণা রমণী

সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে আহার দান, পশু পক্ষীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিয়া জনসমাজকে মোহিত করিতেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্য বৌদ্ধধর্ম্মই কার্য্যতঃ প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বাহ্যিক কলেবর এ দেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে বটে ; কিন্তু বুদ্ধের অমর উপদেশাবলী ভারতবাসীর রক্ত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ভগবান করুন, সঙ্ঘমিত্রার ন্যায়, ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় শত শত রমণী প্রচারিকা পুনরায় ভারতক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইয়া অবশপ্রাণ ভারতসমাজে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করুন। *

তপস্বিনী রাবেয়া।

ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী ও গার্গী, প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানে, তপস্যায় এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানালোচনায় ঋষিদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। শত শত ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষি ও রাজর্ষি সেই স্বর্গীয়া রমণীগণের অসামান্য প্রতিভা ও ধর্ম্মভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা অবলা হইয়াও বিপুল আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণের সহিত সুবৃহৎ রাজসভাতে, তপোবনে এবং যজ্ঞস্থলে, শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বালোচনায় সকলকে বিস্মিত করিতেন। সেই পুণ্যবতী রমণীগণের পবিত্র চরিত পুরাণ ও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে ও

আমরা ঐরূপ স্বর্গীয়া দেবীগণের পবিত্র চরিতকাহিনী পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। রমণীকুলাগ্রগণ্যা মুসলমান তপস্বিনী রাবেয়ার অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত অতি রমণীয় ও ভক্তিপ্রদ।

মুসলমান সমাজে বহুকাল হইতেই অবরোধ প্রথা প্রচলিত। এই অবরোধ-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া রমণীগণ স্বাধীন ভাবে গমনাগমন, নির্জ্জনসাধন বা পুরুষগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি করিতে তেমন সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু যেখানেই স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে, সেখানেই এই সামাজিক-শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়াছে এবং আকাশবাসিনী উন্মুক্ত বিহঙ্গিনীর ন্যায় রমণীগণ পরমেশ্বরের সেবায় স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। জলস্রোত প্রবল হইলে মৃত্তিকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন অতি প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে থাকে; কারাবরোধবাসিনী রমণীগণের প্রাণ যখন স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হয়, তখন তাঁহারা সমাজের সংকীর্ণ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া নবজীবন লাভ করিয়া ও নবশক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া ধর্ম্মের বিজয়পতাকাহস্তে সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

তুরস্কের অন্তর্গত বসোরা নগরে অতি দীন দরিদ্র গৃহস্থের পর্ণকুটিরে রাবেয়ার জন্ম হয়। রাবেয়া অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলেন। "বিপদ কখনও একাকী উপস্থিত হয় না।" কিছু দিন যাইতে না যাইতে, বসোরা নগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অন্নাভাবে সকলে বিষম প্রমাদ গণিল। রাবেয়া এই সময় তাঁহার ভগ্নীগণের নিকট বাস করিতেছিলেন।

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে এক জঘন্য ক্রূরমতি ধনীর নিকট বিক্রয় করিল। দুঃখিনী রাবেয়া পরিজনের নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া দাসীরূপে অন্যগৃহে সজলনয়নে গমন করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য দেশের লোকে পশু পক্ষীর প্রতিও যেরূপ সকরুণ ব্যবহার করিয়া থাকে, সে সময়ে ক্রীত দাস দাসীর প্রতি লোকে তদপেক্ষাও হীন ব্যবহার করিত। যে ব্যক্তি রাবেয়াকে ক্রয় করিল, সে একে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, তাহাতে আবার হিংস্রপ্রকৃতি, সুতরাং রাবেয়া ভয়ঙ্কর কষ্টে পতিতা হইলেন। সেই নিষ্ঠুর প্রভু রাবেয়াকে এত কাজ করিতে আদেশ দিত, যে বালিকা তাহা কিছুতেই সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সকল কার্য্য সমাপন করিতে না পারিলে তাঁহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

এই সময় হইতেই রাবেয়ার প্রাণের গভীরতম স্থানে ধীরে ধীরে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর তিরস্কার, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া সেই অন্তর্যামী পরম প্রভু ভগবানের নিকট ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, প্রাণের সকল কথা দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করিতেন। তিনি প্রতিদিন এইরূপে নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্যাতনপ্রাপ্ত বালিকার কোমল প্রাণ পরমেশ্বরের দয়ার ভিখারিণী হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নির্যাতন বাড়িতে লাগিল। বালিকার প্রাণ অস্থির হইল। এই দুঃসময়ে পতিত হইয়া একদিন তিনি পলায়ন করিবার উদ্দেশে গোপনে গৃহ

পরিত্যাগ করিলেন। অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কণ্টক ও জঙ্গলময় পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভূপতিত হওয়ায় তাঁহার এক খানি হাত ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি আর গমন না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন,—"দীনবন্ধো পরমেশ্বর, আমার পিতা মাতা নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া পরগৃহে বন্দীভাবে কালযাপন করিতেছি। আমি যে কষ্টে আছি, তুমি দেখিতেছ। কিন্তু ইহাতেও আমি শোক করিব না, তুমি যদি প্রসন্ন হও। হে আমার পরমেশ্বর, তুমি কি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবে না?" প্রার্থনার পর তিনি প্রাণে স্বর্গীয় বল লাভ করিলেন। তখন পলায়নে বিরত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

সকলে নিদ্রিত হইলে, তিনি গভীর রাত্রে প্রার্থনা করিতেন। এক দিন তিনি নীরব রজনীতে নির্জ্জন শয়নকক্ষে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময় গৃহস্বামী জাগ্রত হইয়া সেই অস্পষ্ট প্রার্থনাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি মনোযোগের সহিত সেই প্রার্থনা শুনিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন কুটিরে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মন মুগ্ধকারী অমৃতনিস্যন্দিনী প্রার্থনার বাক্য উত্থিত হইতেছিল, সেই প্রার্থনা শুনিয়া গৃহস্বামীর কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, পাষাণ গলিল, মরুভূমিতে জলধারা প্রবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র গৃহস্বামী রাবেয়াকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনারন্যায় পূজনীয়া মহিলাকে দাসীরূপে গৃহে রাখিয়া আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। আমার অপরাধ মাপ করুন

আপনাকে স্বাধীনতা অর্পণ করিলাম। আপনি স্বীয় মনোমত স্থানে বাস করিয়া অভীষ্ট মহৎ ব্রত সাধন করুন।” রাবেয়া ক্রীত দাসীত্ব হইতে প্রমুক্ত হইলেন। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজনের অনুকূল স্থানে গমন করিলেন, এবং কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেকদিন নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া গভীর ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে তিনি মক্কানগরে গমন করেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

রাবেয়া মক্কানগরে তাঁহার কুটীরের মধ্যে উপবিষ্ট। বাহিরে অনেক লোক জন বসিয়া রহিয়াছে। জ্যোস্না-স্নাত-রজনী অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। সুনীল অনন্ত আকাশতল রজতবর্ণে অনুরঞ্জিত। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া বাহির হইতে একজন লোক বলিয়া উঠিলেন—“আর্য্যে, একবার বাহিরে আগমন করুন, দেখুন সৃষ্টির কি অপরূপ শোভা হইয়াছে!” গৃহের অভ্যন্তর হইতে রাবেয়া উত্তর করিলেন, “তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার অরূপ রূপমাধুরী দর্শন কর।” রাবেয়ার ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরপ্রেম কি গভীর ও জ্ঞানমূলকই ছিল। আর্য্যঋষিগণের ন্যায় তিনি স্বীয় আত্মার ভিতরে সেই চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন। যিনি ভিতরে ডুবিয়াছেন, তিনি কি বাহিরের অসার অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্য দেখিয়া অধিক সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

রাবেয়া লেখাপড়া জানিতেন না; ধর্ম্মবিজ্ঞানের জটীল তত্ত্ব শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের সহিত যোগলাভ

করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন, সে সকল কথার সহিত উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিল হইত। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় যাহা বলেন, তাহাই বেদ বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ,বাইবেল। এজন্যই রাবেয়ার প্রত্যেক কথা সকলে,—এমন কি মক্কার সাধুগণও ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেন। রাবেয়াকে দর্শন করিয়া, তাঁহার পবিত্রবাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সকলে কৃতার্থ হইতেন। দলে দলে লোক রাবেয়ার উপদেশ গ্রহণের জন্য দূরদেশ হইতে সমাগত হইত।

রাবেয়া অনেক সময় সমগ্র নিশা উপাসনা ও ধ্যানে যাপন করিতেন। স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার অতি পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাঁহাকে অনেকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তিনি অতি সুন্দররূপে সহজ কথায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেন; সে সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ-সাধনে ভারতের বৈদিক মহর্ষিদিগের সমকক্ষ ছিলেন। নিরক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীনা রমণী যে কেবল ভগবদারাধনায় প্রাণের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ করিতে পারেন, রাবেয়া তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সত্যানুরাগ, ঈশ্বরানুভূতি, ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার হৃদয় বিভূষিত ছিল। তিনি জীবিতাবস্থায় যেরূপ স্বর্গীয়া দেবীরূপে মুষলমান জগতে সম্পূজিতা হইতেন, নানাদেশীয় সাধুগণের মুখে তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সেইরূপ চিরকাল পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

জগাই মাধাই।

গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত, মুরারী গুপ্ত, গদাধর প্রভৃতি সাধু ভক্তগণ হরিসংকীর্ত্তনে প্রমত্ত। নবদ্বীপে প্রেমধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া চৈতন্যের মহাসংকীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন। নবদ্বীপ ভক্ত-পদ-চিহ্ন দ্বারা পবিত্রীকৃত হইতেছে।

একদিন ভক্তশ্রেষ্ঠ গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন;—"নিত্যানন্দ হরিদাস, তোমরা অদ্য হইতে এই নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার কর। সকলকে হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ দাও। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, স্ত্রী পুরুষে, ভেদজ্ঞান করিও না। এ ধর্ম্মে কোনও প্রকার জাতিভেদ নাই। তোমরা প্রতিদিনের প্রচার-বৃত্তান্ত সন্ধ্যাকালে আমাকে শুনাইও।

ভক্তরাজের মুখে হরিনাম প্রচারের আদেশ শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দে পুলকিত হইলেন। ইতঃপর নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন। যাহাদের সহিত দেখা হয়, তাহাদিগকেই বলেন,—"শুন ভাই, যে হরি প্রাণের প্রাণ, যাহা হইতে পিতা মাতা, ধনৈশ্বর্য্য সকলি পাইয়াছ, সেই হরির নাম প্রাণ ভরিয়া বল। তোমাদের মিনতি করিয়া বলি, একবার হরিগুণ গান করিয়া জীবন সার্থক কর; হরি ভিন্ন ইহ পরকালের সম্বল আর কিছুই নাই।

পরম সাধু হরিদাস এবং নিত্যানন্দ এইরূপে নবদ্বীপে নাম

সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। সাধুমুখে পরমপবিত্র হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া বাল বৃদ্ধ যুবা সকলে মোহিত হইয়া যাইতে লাগিল। পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে সকলেই অধিকারী; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধু যখন হৃদয়-মন্দিরে সেই মহান্ দেবতার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তদগত চিত্তে নামোচ্চারণ করেন, সেই নামামৃত গোমুখী নিঃসৃত ভাগিরথীর ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া পাপী তাপীর হৃদয় বিধৌত করিয়া দেয়। সাধক যখন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তখন বাস্তবিকই সংসার মরুক্ষেত্রে স্বর্গের অমৃতধারা বর্ষিত হয়। দুঃখীর দুঃখ, পুত্র-শোকাতুরা জননীর অসহ্য শোক বেদনা এবং পতিহীনার আর্ত্তনাদ প্রভৃতি সকল যন্ত্রণা হরিনাম শ্রবণে দূরীভূত হয়।

একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস গঙ্গার তীর দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে জগাই মাধাইকে তথায় দেখিতে পাইলেন। তাহারা মদের বোতল লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। তাহারা কখন হাসিতেছিল, কখন বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিল, কখন পথিকদিগকে অতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতেছিল। তাহাদের পরিধানে মলিন বস্ত্র, কেশ রুক্ষ, চক্ষু রক্তজবার ন্যায়। তাহারা সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার পৈশাচিক কাণ্ড করিতেছিল।

প্রেমিক নিত্যানন্দ তাহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দুটি লোক কে? আহা, ইহাদের কি আত্মীয় স্বজন কেহ নাই? এরূপ প্রকাশ্যভাবে দুষ্কার্য্য করিতে ইহাদিগকে কি কেহ বাধা দেয় না?"

পথিক কহিল,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, ইহাদের নাম জগাই, মাধাই। ইহাদের আত্মীয় স্বজন সকলি আছে; কিন্তু ইহাদের চরিত্র এমনি কদর্য্য যে, ইহারা পৃথিবীর কাহারও কথা শোনে না। ইহারা না করিয়াছে এমন পাপ নাই। চুরি, ডাকাতি সতীত্ব হরণ, গৃহদাহ ইত্যাদি সকল পাপই ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং নিয়ত হইতেছে। এমন কি, ইহারা ব্রাহ্মণ হইয়া গোমাংসও ভক্ষণ করিয়াছে!"

নিত্যানন্দ। "এ সকল অপরাধের শাস্তি ত রাজাও দিতে পারেন। প্রকাশ্য রাজপথের মধ্যস্থলে বসিয়া চুরি ডাকাতি করিতে কাহারও সাধ্য আছে?"

পথিক। "ইহারা এমনি দুরন্ত যে, কাজি সাহেবও ইহাদিগকে ভয় করেন। সম্মান নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তিনিও ইহাদিগকে শাসন করেন না।"

নিত্যানন্দ। "আচ্ছা ইহারা কি কেবল দোষেরই আকর? ইহাদের মধ্যে কি কোন সদ্‌গুণ নাই?

পথিক। "বাহিরে ত দোষই দেখিতেছি। ভিতরে কোন গুণ আছে কি না, কি করিয়া বলিব? এদের সহিত ত মিশামিশি করি নাই।"

নিত্যানন্দ, হরিদাসের মন পরীক্ষার্থ কহিলেন, "হরিদাস, আমাদের উপর যখন প্রচারের ভারার্পণ হইয়াছে, তখন চল ইহাদের নিকট গিয়া প্রচার করি। আহা হরিদাস! দেখ দেখি ইহারা কেমন কষ্ট পাইতেছে! ইহাদের কষ্ট দেখিয়া কেহ কি স্থির থাকিতে পারে? ইহাদের পরকালে কি গতি হইবে? যবনগণ যখন তোমাকে বাইশ বাজারে

প্রহার করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাদের শুভকামনা করিয়াছিলে। আজ ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার প্রাণ কি কাঁদিতেছে না? আহা! ইহারা কি ক্লেশেই কালযাপন করিতেছে!”

হরিদাস সহাস্তে কহিলেন,—“শ্রীপাদ গোঁসাই যখন প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর উহাদের উদ্ধারের বাকী কি আছে? আপনার প্রসাদে ইহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইবে।”

তখন নিত্যানন্দ হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া জগাই মাধাইর নিকট যাইতে লাগিলেন। পথিকগণ বলিতে লাগিল,—“ইহাদের ধর্ম্ম প্রচারের কি আর স্থান নাই? গোবধ ও ব্রাহ্মনবধে যাহাদের আনন্দ, তাহাদের কাছে ধর্ম্মের কথা! সন্ন্যাসী দুটির আজ অপমৃত্যু দেখিতেছি!” কিন্তু প্রেমধর্ম্ম-প্রচারকদ্বয় কাহারও কথা শুনিলেন না। পাপীর দুঃখে যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত, তাঁহারা কি কোনও প্রকার বিপদাশঙ্কায় কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হন? পাপীর হৃদয়ই ধর্ম্মপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পাপীর উদ্ধার সাধন করাই ধর্ম্মপ্রচারকের প্রধান ব্রত।

তাঁহারা জগাই মাধাইর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই জগাই মাধাই! দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া, কেন তাহার এরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছ? ভাবিয়া দেখ দেখি, পরকালে তোমাদের গতি কি হইবে? পরকাল কেন, ইহকালেই যে তোমাদের কত কষ্ট, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। এই দেহ চিরদিন থাকিবে না,

নির্ব্বাণ হইবে। তখন তোমরা কোথায় দাঁড়াইবে? কে তোমাদিগকে আশ্রয় দান করিবে? ইহকালে কত কষ্টভোগ করিয়া জীবন শেষ করিবে, আবার মৃত্যুর পরেও কত যন্ত্রণা পাইবে। যাহাতে ইহকাল পরকাল উভয় নষ্ট হইবে, কত যন্ত্রণা পাইবে, এমন কাজ কেন করিতেছ? ভাইরে! শ্রীহরি সকলের পিতা মাতা, ইহকাল ও পরকালের সম্বল। দেহ মন ধনৈশ্বর্য্য সকলই তিনি। কুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, অনাচার ছাড়, শ্রীহরির চরণে শরণ লও। দুঃখ যন্ত্রণা থাকিবে না, প্রাণ শীতল হইবে।" "ধর্ ত বেটাদের!" এই বলিয়া জগাই মাধাই রুদ্র মূর্ত্তিতে নিত্যানন্দ হরিদাসকে আক্রমণ করিল। তাঁহারা অগত্যা দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

গৌরচন্দ্র ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ উপস্থিত হইয়া সেদিনকার প্রচার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। চৈতন্য কহিলেন,—"আমি যদি সেই মাতাল দুইটাকে পাইতাম, তবে কেটে দুখণ্ড করিতাম।" নিত্যানন্দ কহিলেন,—"তোমার তাদের উপর এত রাগ! কিন্তু আমি তাহাদিগকে লইয়াই থাকিব। যদি পাপীর কাছে ধর্ম্ম প্রচার না করা হইল, তবে সে ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? সাধু লোকেরা ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সাধন ভজন করেন, তাঁহাদের নিকট প্রচারের বিশেষ কি প্রয়োজন আছে? পাপীর কাছেই ধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃত প্রয়োজন। পাপী যদি উদ্ধার না হয়, তবে হরিনামের মাহাত্ম্য থাকে কোথায়?" গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তাঁহারা যখন তোমাদের দর্শন পাইয়াছে,

বাস্তবিক চৈতন্তের বাক্য ফলিতে লাগিল; জগাই মাধাই কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিত্যানন্দ তাহাদের উদ্ধারের জন্ত-চিন্তিত হইলেন। লোকের নিকট তাহাদের সংবাদ লইতে লাগিলেন। তাহারা কখন কি করিতেছে এবং কি অবস্থায় আছে, তাহা জানিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। একদিন রজনীযোগে নগর ভ্রমণকালে নিত্যানন্দ তাহাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমবার হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুইজন ছিলেন। এবার নিত্যানন্দ একাকী। তখন দিনের বেলা, নিকটে অনেক লোকজন ছিল, এবার রাত্রি কাল। নিত্যানন্দ দস্যুর নিকট একাকী যাইতেছেন। কিন্তু তিনি প্রাণের ভয় রাখেন না। যাহার প্রাণে মমতা আছে, সে ব্যক্তি রজনীযোগে নির্জ্জনে একাকী আক্রমণকারীর নিকট যাইতে কখনও সাহসী হয় না। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক, তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া কখনও ভীত হন না। বর্ত্তমান সময়ে কত খৃষ্টান প্রচারক ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া অসভ্যদিগের হস্তে বন্দি হইতেছেন এবং কত প্রচারকের জীবন বিনষ্ট হইতেছে।

রাত্রিকালে নিত্যানন্দ কোথায় যাইতেছেন? হিংস্রক পশুর নিকটে, সর্পের মুখে হস্ত দিতে যাইতেছেন, সিংহ কবলে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন! জগাই মাধাই নরহন্তা। একাকী নির্জ্জনে নরহন্তার কাছে প্রেমপ্রচার!! ধন্য নিত্যানন্দ! তুমিই যথার্থ প্রেমপ্রচারক। প্রেম কি বস্তু তাহা তুমিই জানিয়াছিলে। পাপী উদ্ধার-ব্রত তুমিই পালন করিয়াছিলে। তোমার অভ্যুদয়ে বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে।

লাগিলেন। দূর হইতে মনুষ্য-পদ-শব্দ শুনিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কে-ও?" নিত্যানন্দ কহিলেন,—"আমি অবধূত।"

"অবধূত?" এই বলিয়া মাধাই নিকটস্থ কলসিভাঙ্গা কুড়াইয়া লইয়া নিত্যানন্দের প্রতি নিক্ষেপ করিল। কলসিভাঙ্গার আঘাতে নিত্যানন্দের শরীরে দর দর রুধির ধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত নাই; তাঁহার প্রাণ জগাই মাধাইর জন্য আরও কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে কহিলেন,—"শ্রীহরি! ইহারা অবোধ, ইহাদের কিছুই জ্ঞান নাই। ইহাদের অপরাধ ক্ষমা কর, ইহাদিগকে সুমতি দাও।" তৎপর মাধাইর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভাইরে মাধাই! তুই আমাকে কলসির কাণা মারিয়াছিস্ তা বলে কি আমি তোকে পরিত্যাগ করিতে পারি? ভাই মাধাই! তুই যে আমারই ভাই। তুই আমাকে চিনিস্ না। কিন্তু আমি যে তোকে চিনি। তুই যে আমারই পিতার সন্তান। আমরা যে এক পরিবারের লোক। তবে কি তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারি? মেরিছিস্ মেরেছিস্, আয় ভাই! কাছে আয়, একবার কোল দি। আয় ভাই, একবার ভাই ভাই মিলে হরিনাম কীর্ত্তন করি।"

জগাই নিকটে থাকিয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছিল। মাধাই নিত্যানন্দকে আঘাত করিতেছে, নিত্যানন্দ তাহাকে কোল দেওয়ার জন্য হস্ত বিস্তার করিয়া আসিতেছেন, তাই

হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব দৈবশক্তি সঞ্চারিত হইল। তাহার পাপজীবনের ছবি মানস-চক্ষুর নিকট উদ্ভাসিত হইল।

অগ্নির সংস্পর্শে গেলে লোকে যেমন উত্তাপ অনুভব করে, শীতল স্থানে যেমন শরীর কম্পিত হয়, তেমনি সাধু সংসর্গে গেলে নিদ্রিত সাধুপ্রবৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়া থাকে। সাধু দর্পণ স্বরূপ। দর্পণে যেমন মুখাকৃতি দৃষ্ট হয়, তেমন সাধুর সংসর্গে স্বীয় চরিত্রের প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট দেখা যায়। নিত্যানন্দের ধর্ম্মভাবের বাতাসে, জগাইর হৃদয়সাগরে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

নিত্যানন্দকে মাধাই পুনরায় প্রহার করিতেছে, দেখিয়া জগাই সকরুণ স্বরে কহিল, "ওরে মাধাই! দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে কি এমন করিয়া মারিতে আছে? ইঁহাকে মারিয়া লাভ কি ভাই? ইঁহার মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া তোর কি একটু দয়া হইল না?"

নিত্যানন্দের দেবভাব দর্শন করিয়া জগাইর পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল। যে হৃদয় রাজার কঠোর শাসনে কোমল হয় না, যে হৃদয় স্নেহ মমতা বর্জ্জিত নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি, সে হৃদয় দৈবশক্তির সংস্পর্শে আসিয়া পরাস্ত হইল।

যেখানে এ সকল ব্যাপার হইতেছিল, তাহার নিকটেই বিশ্বম্ভরের বাড়ী। বিশ্বম্ভরকে গিয়া কে খবর দিল যে, জগাই মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিতেছে। বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বিদ্যুৎবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিত্যানন্দ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া জগাই

রুধিরধারা প্রবাহিত হইতেছে। বিশ্বম্ভরসহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি উত্তেজিত হইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "তুমি স্থির হও। আমার অনুরোধ, ইহাদিগকে কিছু বলিতে পারিবে না। জগাইর দোষ নাই। মাধাই মারিতেছিল, জগাই তাহাকে বার বার নিষেধ করিয়াছে। আমার শরীরে বেশী আঘাত লাগে নাই। আইস সকলে মিলিয়া উহাদিগকে হরিনাম শুনাই।"

জগাই প্রহার করে নাই, বরং মাধাইকে প্রহার করিতে দেখিয়া সে নিষেধ করিতেছিল, এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌরের প্রেম-প্রবণ-হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। জগাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন, "জগাই রে! তুই আজ আমার কি উপকার করিলি! আমার নিতাইয়ের প্রাণ রক্ষা করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইলি! তুই ধন্য! হরিপদে তোর মতি হউক, তোর পাপ তাপ সব দূর হউক।"

জগাইর মনে পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যেটুকু বাকী ছিল তাহা চৈতন্যের সংস্পর্শে পূর্ণ হইল। অনুতাপের তীব্র হুতাশনে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। গৌরের পাদমূলে পতিত হইয়া সজল নেত্রে কহিতে লাগিল, "প্রভো! এ নারকীর কি আর উদ্ধার আছে? আমি কত সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছি, কত লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছি, আমার পাপের সংখ্যা নাই। এমন দিন, এমন দণ্ড অতিবাহিত হয় নাই, যখন আমি কোনও পাপ কার্য্য না করিয়াছি।

প্রভো! আমার উদ্ধার কিরূপে হইবে? আমি তোমার চরণ ছাড়িব না, আমাকে উদ্ধার কর। আমি বুঝিয়াছি, তোমরা সামান্য মনুষ্য নও। মারখেয়েও যে প্রেম বিলায়, সে কি সাধারণ মানুষ! বহুদিন হইতে আমরা এখানে আছি, কিন্তু এমন লোকের সহিত ত কখনও দেখা হয় নাই, তোমরা দেবতা।"

জগাইর পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ মাধাইর হৃদয়েও গিয়া লাগিল। তাহারা দুইজনে শৈশব হইতে একত্র বাস করিতেছে, যত কিছু পাপানুষ্ঠান একত্রেই সম্পন্ন করিতেছে। উভয়ের মধ্যে দুশ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব। একে অন্যকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারে না। সকল অবস্থাতেই উভয়ে উভয়ের সাহায্যকারী। উভয়ের প্রাণে প্রাণে, মনে মনে বড়ই মিল। সুতরাং মাধাই অদূরে বসিয়া জগাইর কাতরোক্তি এবং আত্মগ্লানির জ্বালা অনুভব করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে গৌরের কাছে গিয়া কহিল, "আমরা উভয়ে পাতকী। উভয়ে একত্রে পাপ করিয়াছি। সুখ দুঃখ যখন যাহা ঘটিয়াছে, উভয়েই বহন করিয়াছি। আজ জগাই উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, আমি কি এই নরকেই বাস করিব? গৌর! তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, আমাকে রক্ষা কর। আমি বড় দুরন্ত পাপী। তুমি ভিন্ন কে আমাকে পরিত্রাণ দিবে? আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম।" এই বলিয়া মাধাই যেই গৌরের চরণে পতিত হইতেছিল, অমনি গৌর বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার পাপের নিষ্কৃতি নাই। তুমি সাধুদেহে

মাধাই কহিল,—"আমার উদ্ধার না হইলে আর তোমাকেই বা ছাড়ে কে? শুনিয়াছি তোমাদের শরণ হইলে, পাপী পুণ্যবান হয়, আমার কি গতি করিবে না?"

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের দিকে চাহিলেন, নিত্যানন্দ মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। সাধু-সংস্পর্শে মাধাইর চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। মাধাই নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বম্ভর কহিলেন "শুন জগাই মাধাই! তোমরা আর কখনও পাপ করিও না। তোমরা যদি আর পাপ না কর, তবে শ্রীহরি তোমাদের গত জীবনের সমুদয় পাপ বিনাশ করিবেন। তোমাদিগকে দেখিয়া পূর্ব্বে যাহারা ঘৃণা করিত, এখন তাহারা ভক্তি করিবে; যাহারা তোমাদিগকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গাস্নানে পবিত্র হইত, এখন তাহারা তোমাদের স্পর্শে নিজকে পবিত্র মনে করিবে। সাধুভক্তের ইচ্ছা কখনও বিফল হয় না, নিত্যানন্দের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।"

তখন বিশ্বম্ভর জগাই মাধাই ও ভক্তদলকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্যকার কীর্ত্তনে স্বর্গের ছবি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইল। জগাই মাধাইর গলা ধরিয়া ভক্তগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাই স্বীয় স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। পাপীর প্রতি ভক্তের অপরিসীম দয়া দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় বিমুগ্ধ হইল। তাঁহারা বারংবার "হরি বোল, হরি বোল" বলিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে গৌর, ভক্তদলকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

সকলে ক্ষমা কর।” জগাই মাধাই প্রত্যেকের নিকট গিয়া চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সকলে আনন্দচিত্তে তাঁহাদের দুষ্কার্য্য ক্ষমা করিলেন। তখন গভীর রজনীতে গৌর ভক্তদল সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। জগাই, মাধাইকে কহিলেন,—"ভাই মাধাই! এই সেই পুত সলীলা গঙ্গা, যাঁহার তীরে বসিয়া আমরা কত পাপ করিয়াছি। এ সকল স্থান আমাদের বিহারক্ষেত্র। কিন্তু ভাই! আজ যেন অন্তরূপ বোধ হইতেছে। সেই গঙ্গা, সেই তট, সেই বন, উপবন, সেই আমাদের বাসস্থান সকলি দেখিতেছি যেন অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। লোকজন অন্তরূপ দেখিতেছি। আজ দেখিতেছি, চন্দ্র সুধা ধারা বর্ষণ করিতেছে,—গঙ্গা কল কল নাদে স্বর্গের মহিমা গাহিতেছে,—বায়ু মৃদু মন্দ গতিতে ভগবানের সমাচার প্রদান করিতেছে,—বিশ্বসংসার হরিতে নিমগ্ন রহিয়াছে,—সকলই যেন তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিতেছে। যেদিকে দর্শন করি, সে দিকেই সাধু-ভক্তসহ শ্রীহরিকে দর্শন করিতেছি। যাহা শ্রবণ করি, তাহাই অতি সুমিষ্ট। আমার এই চক্ষু কর্ণ ত পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু মাধাই! আমার প্রাণটা এমন ছিল না। ভাইরে! আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি। আমাদের মত কত লোক নরকে পড়িয়া রহিয়াছে। হায় হায়, মোহাভিভূত জীবের অবস্থা কি ভয়ানক!"

জগাই মাধাই বৈষ্ণব দলে বাস করিয়া কঠোর সাধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া লক্ষ হরিনাম যপ করিতেন এবং সাধুর পদধূলি গ্রহণ

করিতেন। পূর্ব্ব পাপ স্মরণ করিয়া কতই ক্রন্দন করিতেন। অনেক সময় অনাহারে থাকিতেন। বিশ্বম্ভর সম্মুখে বসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন।

মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়াছিলেন, এই অনুতাপে তিনি দিন দিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রহারিত হইয়াও প্রেম বিতরণ করেন, তাহাকে প্রহার! মাধাই অস্থির হইয়া কতদিন নিত্যানন্দের চরণে পড়িয়া কাঁদিলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রাণের জ্বালা দূরীভূত হইল না। একদিন মাধাই নিত্যানন্দকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন,—"প্রভো, বলুন, কি করিলে আমার এই পাপ যায়। আপনার অঙ্গে আঘাত করিয়াছি, এ কথা স্মরণ হইলেই আমি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাই।"

নিত্যানন্দ কহিলেন,—"তুমি আমার পুত্র, পুত্র যদি পিতাকে প্রহার করে, তাহাতে কি পিতার ব্যথা লাগে ?" মাধাই কহিলেন,—"প্রভো, যদি আমাকে দয়া করিলেন, তবে বলিয়া দিন, আমি যত লোকের হিংসা করিয়াছি, সে সকল অপরিচিতগণের নিকট আমি কিরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিব ? ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে ত পাপ দূরীভূত হয় না।"

নিত্যানন্দ কিছুকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন,—"গঙ্গাতীরে যত স্নানের ঘাট আছে, তাহা তুমি প্রতিদিন স্বহস্তে পরিষ্কার করিবে এবং গঙ্গাতীর দিয়া যত লোক গমনাগমন করিবে, তাহাদিগকে দৈন্যভাবে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তবেই তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।"

মাধাই তাহাই করিলেন। স্বহস্তে কোদালী দ্বারা গঙ্গার সমুদয় ঘাটগুলি পরিষ্কার করিয়া গঙ্গাস্নান যাত্রী সকলের

নিকট সাশ্রুনয়নে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা, এবং প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম যপ করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাইর তপস্তা এবং প্রেম ভক্তি দর্শনে নবদ্বীপের লোক মোহিত হইতে লাগিল।

ওমর।

প্রত্যাদিষ্ট মহম্মদ জ্বলন্ত উৎসাহে ইস্‌লাম্‌ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। খাদিজা, আলী, জয়দেব প্রভৃতি উনচল্লিশ জন ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। পথে ঘাটে তাঁহারা প্রহারিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। মহম্মদই সকল অনর্থের মূল, সুতরাং বিরোধিগণ তাঁহার প্রাণনাশে দৃঢ় সংকল্প হইল। একদিন সমবেত দেবোপাসকদিগের সম্মুখে, আবুজ্জহল নামক জনৈক কোরেশ দলপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "হে, কোরেশগণ! শুন, মহম্মদ আমাদের ভয়ানক শত্রুতা সাধন করিতেছে। সে আমাদের লাত,গরি, ও মনাত প্রভৃতি দেবদেবীদিগকে স্বীকার করে না। অধিকন্তু বলে যে, প্রতিমা পূজা করিয়া না কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নরকবাস করিতেছে! এ সকল কথা আর সহ্য হয় না। সত্বরেই ইহার প্রতিবিধান করা উচিত। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে ব্যক্তি মহম্মদকে হত্যা করিতে পারিবে, তাহাকে এক শত উষ্ট্র ও এক সহস্র মুদ্রা দান করিব।"

আবুজ্জহলের এই উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ওমর নামক একজন অতি দুর্দ্দান্ত কোরেশ দণ্ডায়মান হইল। তাহার

শরীর দীর্ঘায়ত, মাংসপেশী ভীমকায় গণ্ডারের ন্যায় সুদৃঢ়, চক্ষু রুদ্র-ভাবের প্রতিকৃতি জবাকুসুম-সংকাশ-আরক্তিম, বক্ষস্থল অতি বিশাল। তাহার এবম্ভূত ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই আশা করিল যে, নিশ্চয়ই ওমরের হস্তে ধর্ম্মদ্রোহী মহম্মদ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ওমর সদন্তে কহিল, "মহম্মদকে বিনাশ করিবার জন্য এই শাণিতখড়্গ উন্মুক্ত হইয়াছে। মক্কাবাসিগণ বিশেষরূপে আমার পরাক্রম অবগত আছে। আমার অসির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এমন বীর মক্কাতে নাই। নিশ্চয়ই আমার এই তৃষিত-কৃপাণ আজ ধর্ম্মদ্বেষী মহম্মদের রুধির পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। তোমাদের কোনও চিন্তা নাই।" আবুজহল, ওমরকে সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর ওমর কাবা মন্দিরের দেবদেবীর সম্মুখে মহম্মদ বিনাশার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উলঙ্গ তরবারি হস্তে বহির্গত হইল।

ক্ষুধিতশার্দ্দুলের ন্যায় ওমর মক্কার রাজপথ দিয়া গমন করিতেছে। একজন মুসলমান পথিক ওমরকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওমর! কোথায় যাইতেছ?" ওমর কহিল,—"কোরেশ-শত্রু মহম্মদকে বিনাশ করিবার জন্য যাইতেছি।" পথিক পুনরায় কহিলেন—"এই গুরুতরব্যাপারে কেন তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ? মহম্মদকে কি বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে?"—"বোধ হয় তুমি মুসলমান,—তবে এস, তোমার দ্বারাই প্রথমতঃ খড়্গ পরীক্ষা করি।" এই বলিয়া ওমর তাঁহার প্রতি অসি উত্তোলন করিল, মুসলমান সভয়ে দ্রুত প্রস্থান

পুনরায় নয়িম নামক একজন মুসলমানের সহিত ওমরের সাক্ষাৎ হইল। নয়িম ওমরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"মহম্মদকে বিনাশ করিতে গিয়া তুমি নিজেই বিনষ্ট হইবে। মহম্মদকে বিনাশ করিতে পারে, এমন লোক পৃথিবীতে নাই, তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত।" ওমর তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য খড়্গ তুলিল। নয়িম পশ্চাৎ সরিয়া কহিলেন,—"আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? আমি তোমাকে এক আশ্চর্য্য সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার ভগ্নী ফতেমা ও তাঁহার স্বামী সয়িদ মুসলমান হইয়াছেন। এখন তাঁহারা লাত, গরিকে মানেন না; এক ঈশ্বরের মাত্র ভজনা করেন, নমাজ পড়েন। আগে তুমি নিজের ঘর রক্ষা কর, পরে অন্যকে শাসন করিও।" এই কথা শুনিয়া ওমর অপ্রতিভ হইল এবং তাঁহারা যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ চাহিল। নয়িম কহিলেন,—"তুমি এক কর্ম্ম করিবে, একটি মেষ বলি দিয়া তাহার মাংস তোমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে ভোজন করিতে দিবে। যদি তাঁহারা তোমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট মেষমাংস ভোজন করেন, তবে জানিবে, তাঁহারা তোমার ধর্ম্মে আছেন, অন্যথা মুসলমান হইয়াছেন।"

ওমর সক্রোধে ভগ্নীর গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেই সময় কোরাণের 'তাহা' নামক সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। ওমরের ভগিনী ও ভগিনীপতি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া খোব্বাবের নিকট সেই সুরা আবৃত্তি করিতেছিলেন। এমন সময় দূরাগত ভীম অজগরের ন্যায় ওমর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল এবং গৃহে কি

অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, বজ্র-দৃঢ়-হস্তে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। গৃহস্থিত সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন। সয়িদ বুঝিলেন, ধর্ম্মবিরোধী ওমরই আসিয়াছে। তিনি সশঙ্কচিত্তে খোব্বাবকে গৃহের এক গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ওমর ব্যাঘ্রলম্ফে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"কি পড়া হইতেছিল ?" তাহার ভগ্নী বিনীত ভাবে কহিলেন,—"কোনও বিশেষ বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল।" ওমর কহিল,—"আমার একটী মেষ আবশ্যক।" সয়িদ মেষ উপস্থিত করিলেন। ওমর মেষটিকে বধ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিল এবং ভগ্নী ও ভগিনীপতিকে আহার করিতে বলিল। তাঁহারা কহিলেন,—"ওমর, আমরা কোনও মহৎ সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে বলি প্রদত্ত মাংস ভোজন করা নিষিদ্ধ।"

তখন পথিকের কথা সত্য বলিয়া ওমরের বিশ্বাস হইল। সে ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভগ্নীকে প্রহার করিতে লাগিল। সয়িদ ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীকে প্রহারিত হইতে দেখিয়া রক্ষা করিতে গেলেন, ওমর ভগ্নীকে ছাড়িয়া ভগিনীপতির উপর পতিত হইল। ফতেমা স্বামীর প্রাণ বিনষ্ট হইতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। খোব্বাব এতক্ষণ গোপনে ছিলেন, কিন্তু ফতেমার আর্ত্তনাদে অস্থির হইয়া সয়িদকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দুরন্ত ওমর দুই জনকেই নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। তাঁহাদের প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা দেখিয়া ফতেমা কহিলেন,—"ভাই ওমর! ইহাদিগকে ছাড়, নির্দ্দোষীকে মারিয়া লাভ কি ?" ওমর ফতেমার ললাটে গুরুতর আঘাত করিল, তাঁহার কপাল

সঙ্গে ফতেমার প্রাণে এক স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত হইল! তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ওমর! তবে শোন, আমরা পবিত্র ইস্‌লাম্ ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পরমেশ্বরের বিধানের আশ্রয়ে আসিয়াছি। মহম্মদই আমাদিগকে এই পবিত্রপথে আনিয়াছেন। আমাদের উপাস্য একমাত্র পরমেশ্বর। ভাই, তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি দূর হউক। তুমি অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও।"

ভগিনীর আরক্তিম মুখমণ্ডল দর্শন এবং তেজোময়বাক্য শ্রবণ করিয়া ওমরের কঠোরহৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল। সে সয়িদ ও খোব্বাব কে পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট হইল। ওমর তিনটী নিরীহ ধার্ম্মিকের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিল, আঘাতে আঘাতে তাঁহাদের শরীর ভগ্ন করিল; তথাচ তাঁহারা স্বীয় বিশ্বাসে অটল এবং প্রসন্ন রহিলেন। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া ওমরের কঠোর মন মুগ্ধ হইল। অপরদিকে ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া ফতেমা ওমরকে যাহা বলিলেন, তাহা বাণের ন্যায় ওমরের কঠিনহৃদয় ভেদ করিল। যে বীর-হৃদয় শত প্রহরণের আঘাতেও দমিত হয় না, তাহা অদ্য ধার্ম্মিকের কোমল স্পর্শে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নির্বীর্য্য হইল। ওমর স্বীয় দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণে ধীরে ধীরে স্বর্গীয় আলোক সঞ্চারিত হইল।

ওমরের প্রাণে আশাতীত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি সমস্ত রজনী গৃহকোণে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সয়িদ ও ফতেমা গৃহের অপর প্রান্তে গিয়া শয়ন করিলেন।

ফতেমা ও সয়িদ গাত্রোত্থান করিয়া অজু করিলেন এবং ভক্তিভাবে সুরা পাঠ করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বর সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই একমাত্র আরাধ্য, পূজনীয়, এই ভাবের একটি পাঠ আবৃত্তি করিলেন। সুরা ও বচনের ভাষা ও ভাবের মিষ্টতায় ওমরের প্রাণ মোহিত হইল। ওমর ধীরে ধীরে, সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল সকল স্থানেই কি তোমাদের ঈশ্বরের আধিপত্য ?” ফতেমা কহিলেন—“হাঁ ভাই, একমাত্র মহান্ পরমেশ্বরই এই অনন্ত-রাজ্যের রাজা। এমন কোনও স্থান নাই, যাহা তাঁহার অধিকার বহির্ভূত।” ওমর কহিলেন,—“আমাদের পনর শত দেবতা আছে, মক্কার হস্তপরিমিত ভূমিতেও তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব দেখিতেছিনা, পুস্তক খানা দেও দেখি।” ফতেমা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পুস্তক খানা ওমরের হস্তে দিলেন। ওমর আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। ফতেমা ভ্রাতার হৃদয়পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন।

ওমর কিয়ৎক্ষণ পুস্তক পাঠ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপর অতি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—“বাস্তবিক তোমাদের এই ধর্ম্মই সত্য, জগতের মালিক এক জনই। আমরা যে সকল দেব দেবীর পূজাকরি, তাঁহারা ঈশ্বর নহে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সৃষ্টি করিতে পারে, তাঁহাদের এমন ক্ষমতা নাই। তাহাদের কোন্ ক্ষমতাই বা আছে, তাহারা গাছ, পাথর বৈত নয় ? আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি, তোমরা যে ঈশ্বরের পূজা কর, তিনিই সত্য। তিনি ভিন্ন, এই দুনিয়ায় আর কেহ মালিক নাই।”

এই সময় খোব্বাব আসিয়া শুনিলেন, ওমর সুরার ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি অতীব আনন্দচিত্তে ওমরের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ওমর! ভাই! তোমার হৃদয় পরিবর্ত্তনের অন্ত গতরাত্রে হজরতমহম্মদ প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা পরমেশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই, তুমি ত আমাদেরই ভাই। এস, সকলে মিলিয়া পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করি।"

ওদিকে, মহম্মদের প্রাণ বিনাশার্থে ওমরের বহির্গমন বার্ত্তা অবগত হইয়া মুসলমানগণ তাঁহার জীবন রক্ষার্থে বদ্ধ পরিকর হইলেন। এসময় মহম্মদ হম্‌জার্ গৃহে ছিলেন। মুসলমানগণ অস্ত্র শস্ত্র সহ সেই গৃহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। হজরতের জন্য সকলেই উদ্‌বিগ্ন। কিন্তু এই বিপদের সময়েও অনলোপম-উৎসাহিত-প্রাণ একজন মুসলমান নগরে গিয়া প্রকাশ্যভাবে নবধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মহম্মদের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মহম্মদ মণ্ডলীর লোকদিগকে সবিশেষ চিন্তাকুল দেখিয়া স্বীয় উষ্ণীষ মস্তক হইতে ভূতলে স্থাপন করিলেন এবং উত্তরীয়বস্ত্র গলদেশে প্রদান করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"প্রভো, ধরাতলের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত এই ঊনচল্লিশ জন মাত্র তোমার দাস আছে, যাঁহারা একমাত্র তোমাকে পূজা করিতেছে, এবং মন প্রাণে তোমার প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়াছে। এই দীন দুঃখীদিগের অন্তরের সন্তাপ ও চক্ষের জলের অনুরোধে ইহাঁদিগকে সেই ধর্ম্মদ্রোহীদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে রক্ষা কর। এই দুর্ব্বলদিগের

সাহায্যের জন্য কোরেশগণের মধ্য হইতে এমন একজন শক্তিশালীপুরুষ প্রেরণ কর, যিনি এই দীন দুঃখীদিগের ক্ষত হৃদয়ে ঔষধ লেপন করিতে সক্ষম হইবেন।”

হজরতের প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে রুদ্ধদ্বারে আঘাত হইল। পারিষদগণ দেখিলেন, ওমর উপস্থিত! তাঁহার স্কন্ধদেশে ভীষণ করবাল ঝুলিতেছে। সকলে ব্যস্ত হইলেন। হম্‌জা কহিলেন,—“ভয় কি? এক ব্যক্তি বৈত নয়, আমি একাকীই উহাকে বাধা দিব।” এই বলিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া সশস্ত্র বাহিরে গেলেন এবং বলিলেন,—“ওমর! তুমি আমার বিক্রম জান। আমি অব্‌দোল্ মত্‌লবের সন্তান। আমরা লৌহ চিবাইয়া খাইতে পারি। যুদ্ধ করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আমি মহম্মদের রক্ষক, আমাকে বিনাশ না করিলে সাধ্য কি আছে, তুমি গৃহে প্রবেশ কর?”

ওমর হস্তস্থিত অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সজল নয়নে কহিলেন,—“ভাই সকল, তোমরা শুন, আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, পরমেশ্বর ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।” এই কথা শুনিয়া মহম্মদ গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া ওমরকে কোল দিলেন। সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। তৎপর একে একে নবধর্ম্মবাহিগণ ওমরকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হজরত! এখন আমাদের সংখ্যা কত?” মহম্মদ কহিলেন—“তোমাকে লইয়া চল্লিশজন পূর্ণ হইল।” ওমর কহিলেন—“হজরত।

লোকে পুতুল পূজা করিয়া থাকে, আমরা ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বরের পূজা গোপনে করিব, ইহা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আজ চলুন, সকলে গিয়া কাবা মন্দিরে উপাসনা করি।" কাবা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করাই স্থিরীকৃত হইল।

ওমর দলের অগ্রভাগে। হজরতের সম্মুখে আলী, দক্ষিণে আবুবেকার এবং বামে হম্‌জা, অন্যান্য সকলে পশ্চাতে। অদ্যকার দৃশ্য অতি মনোহর। ঘোর অত্যাচারী অদ্য প্রেম-পিঞ্জরে অবরুদ্ধ হইয়াছে। ওমরকে পাইয়া মুসলমানগণ হাতে আকাশ পাইয়াছেন।

এদিকে কাবা মন্দিরে কোরেশগণ সম্মিলিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মহম্মদের বধচিন্তা করিতেছে। এমন সময় তাহারা অদূরে মহম্মদের দল দেখিতে পাইল। অগ্রে ওমর, পশ্চাতে মহম্মদ আসিতেছেন। তখন তাহারা আনন্দিত চিত্তে বলিতে লাগিল—"ওমর সকলকে বন্দী করিয়া কাবা মন্দিরে আনিতেছে। এখানে বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া যাইবে।" ওমর মন্দি-রের নিকটবর্ত্তী হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আমি মহম্মদকে বিনাশ করিতে গিয়া, তাঁহার ধর্ম্ম স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি। এই ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরই সত্য। দেব দেবী মিথ্যা। তোমরা মিথ্যাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হও।"

ওমরের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। তাহারা একে অন্যের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। একজন

হইয়াছ ?” ওমর কহিলেন—“হাঁ, আমি সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোমরাও গ্রহণ কর। গাছ্ পাথর পূজা করিলে পরিত্রাণ পাইবে না।” কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে,মহম্মদের মস্তক গ্রহণ করিতে গিয়া ওমর নিজেই তাঁহার চরণে মস্তক দান করিয়াছে। তখন উভয় পক্ষে ক্ষুদ্র একটি যুদ্ধ হইয়া সে দিনের ব্যাপার শেষ হইল।

ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইল। আবুবেকার, আলী, ওস্মান, ও ওমর এই চারিজন মহম্মদের চির-ধর্ম্মসহচর ছিলেন। ইহাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাস, মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য একান্ত আগ্রহ ও পরিশ্রম, মুসলমান জগতে অতি প্রসিদ্ধ। মহম্মদের পরলোক গমনের পর আবুবেকার খলিফা পদে অভিষিক্ত হন, তাঁহার পরে ওমর খলিফা হইয়াছিলেন। ওমরের দ্বারাই ইয়ুরোপ ও আফ্রিকা পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয় এবং মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। হজরত মহম্মদ কর্ত্তৃক ওমর ফারুক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্যও অসত্যে যিনি প্রভেদ দেখেন, তাঁহাকেই ‘ফারুক’ বলে।

সেণ্ট্ পল্।

মহর্ষি-ঈশা ক্রুশে নিহত হইয়াছেন। বিরোধী ফিরুসি ও সাডিয়ুসিগণ মহোল্লাসে উদ্ভ্রান্ত। জুডিয়ার সর্ব্বত্র প্রাচীনের জয়, নবীনের পরাজয় ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ খৃষ্টশিষ্যগণ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। তাঁহারা যদিও

সংখ্যায় অতি অল্প, যদিচ ধনবল জনবলে হীন, যদিও তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে নগণ্য, তথাচ তাঁহারা আধ্যাত্মিক সমরে অজেয়। এই জন্য অজেয় যে, তাঁহারা ঈশার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত।

ষ্টিফেন্, খৃষ্ট-শিষ্যগণের অগ্রণী। তাঁহার বিশ্বাস ও ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া, দলে দলে লোক নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। সুতরাং শত্রুগণের বিষদৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে ষ্টিফেনের উপরেই পতিত হইল। অত্যাচারীদিগের মধ্যে একজন যুবক সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী। এই যুবক ইহুদি-বংশ-জাত, বাড়ী টার্সস্ নগরে। ইনি তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধিকতর উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় জেরুজেলামে গমন করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক গ্যামেলিয়েলের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হন। গ্যামেলিয়েল সে সময়ে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। উক্ত যুবক অল্পকালমধ্যে গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। তর্কশাস্ত্রে এবং দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিল। যুবকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মহিয়সী প্রতিভা এবং অদম্য তর্কশক্তির প্রশংসা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কিন্তু তাঁহার এই সমগ্র অতুলশক্তি সাধু ষ্টিফেনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইল। তিনি খৃষ্টধর্ম্মকে বিনাশ করিবার জন্য জ্ঞানাস্ত্র এবং লৌহাস্ত্র উভয়ই প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁর নাম "সল" বা "পল।"

পলপ্রমুখ অত্যাচারিগণ ষ্টিফেনের বিরুদ্ধে এই বলিয়া প্রাচীন

অমান্য করে, ধর্ম্মসমাজকে ঘৃণা করে এবং পরমেশ্বরের নিন্দা করে।" প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অভিযোগকারিগণ এসকল বিষয় প্রতিপন্ন করিল। বিচারকও তাহাদিগের দলের লোক, সুতরাং অবিলম্বে বিচার-মঞ্চ হইতে ষ্টিফেনের প্রাণ দণ্ডের অনুজ্ঞা প্রকাশিত হইল।

প্রস্তরাঘাতে ষ্টিফেনের প্রাণনাশ করা হইবে, বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অবিলম্বে ষ্টিফেন বধ-স্থানে নীত হইলেন। তাঁহার নয়ন ঊর্দ্ধদিকে, তাঁহার হৃদয় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া প্রেম-ময়ের অমৃতসহবাস লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি স্থির গম্ভীরভাবে যোগযুক্ত হইয়া বধ-স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিরোধীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পলের মুখ অধিকতর প্রফুল্ল। অদ্য হইতে খৃষ্টধর্ম্মের মূল বিনষ্ট হইল, ইহা ভাবিয়া তিনি আনন্দিত। তিনি নবোৎসাহে বধকারীদিগের উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া এক স্থানে বসিলেন এবং কহিলেন, "তোমরা ঐ বিধর্ম্মী পাষণ্ডকে বধ কর, আমি তোমাদের বস্ত্রাদি রক্ষা করিতেছি।" পলের বাক্য শেষ হইতে না হইতে চতুর্দ্দিক হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় প্রস্তরখণ্ড পতিত হইতে লাগিল। ষ্টিফেনের মুখ, নাসিকা, হস্ত, পদ, বক্ষস্থল কাটিয়া সবেগে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কোনও প্রকার বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার গুরুদেব যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও যেরূপে সমাহিতভাবে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপে স্বর্গস্থ পিতার দিকে দৃষ্টি করিয়া শান্তভাবে

ষ্টিফেনের হত্যার পরে পলের অত্যাচার দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি অতি নৃশংসভাবে বিবিধ উপায়ে নিরীহ খৃষ্টানদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। নবধর্ম্ম আমূল বিনাশ করিবেন, ইহাই পলের ব্রত। পলের পাশবিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একদল খৃষ্ট-শিষ্য জেরুসেলাম নগর হইতে ডামাস্কস্ নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। অবিলম্বে এই সমাচার পলের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ জেরুসেলামের ইহুদি ধর্ম্মযাজক থিওপিলাসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আমি এই মাত্র শুনিতে পাইলাম, খৃষ্টের কতকগুলি শিষ্য জেরুসেলাম হইতে পলায়ন করিয়া ডামাস্কসে গমন করিয়াছে। ত্বরায় ঐ সকল লোকদিগকে আনিয়া কারাগারে বন্দী করা আবশ্যক। অতএব আমি তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ডামাস্কস্ যাত্রা করিতেছি। আপনি তথাকার ইহুদি ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিন যে, পলায়িত খৃষ্ট-শিষ্যদিগকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহারা যেন আমার সহায়তা করেন।"

ধর্ম্মযাজক স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে পলের এরূপ ব্যগ্রতা ও উৎসাহ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনুরোধপত্র লিখিয়া দিলেন। পল ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কয়েক জন সঙ্গিসহ অশ্বারোহণে ডামাস্কস্ যাত্রা করিলেন।

পল প্রফুল্লচিত্তে যাইতেছেন। খৃষ্ট-শিষ্য দিগের প্রাণ-বিনাশ করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ডামাস্কসের

সীমায় উপনীত হন, এই সময় অকস্মাৎ পলের সম্মুখে এক প্রখর আলোক উদ্ভাসিত হইল। তাঁহার বাহ্য দৃষ্টিশক্তি রোধ হইল, তিনি ঘোটক স্থির রাখিয়া চক্ষু নিমীলন করিলেন। তখন তিনি মানস-চক্ষে দেখিতে পাইলেন, বক্ষে ক্রুশধারী দিব্য মূর্ত্তি যীশুখৃষ্ট সেই জ্যোতির ভিতর হইতে বলিতেছেন;—"সল, সল! তুমি কি আমাকে হত্যা করিবে?" পলের হৃদয় স্তম্ভিত হইল! তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কিছু দেখিতে পাইয়াছ কি?" সঙ্গীয় সকলেই এক বাক্যে উত্তর করিল—"আমরা ত কিছু দেখি নাই।" পল কাহাকেও কিছু না বলিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন এবং ইহুদি ধর্ম্মমণ্ডলীতে উপনীত না হইয়া খৃষ্ট-শিষ্য জুডাসের ঘরে গিয়া অনশনে থাকিয়া তিন দিন ধ্যান করিলেন।

পলের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি দৈব বাণীর অনুসরণ করিলেন। যে বিপুলশক্তি খৃষ্ট-শিষ্যগণের প্রাণ-বিনাশে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে অর্পিত হইল। নরহন্তা, ঘোর পাষণ্ডের দেহ মন নবধর্ম্মের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইল। এই সময় এনানিয়স্ নামক একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সহিত পলের সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার নিকট পল দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আততায়ী পরম মিত্র হইলেন, বিষবৃক্ষ চন্দন তরুতে পরিণত হইল, কালভুজঙ্গ হইতে অমৃত ক্ষরিত হইল। পলের এরূপ পরিবর্ত্তনে খৃষ্টশিষ্য-মণ্ডলী দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত মহান্ পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। পল দীক্ষিত

কিয়দ্দিন পর মহাত্মা পল বিশেষরূপে ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য আরবের অন্তর্গত এক নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেখানে গভীরভাবে সাধন ভজন করিয়া প্রবল উৎসাহের সহিত প্রচারে বহির্গত হন। তাঁহার বিশ্বাস বৈরাগ্য, ও সেবাময় জীবন দেখিয়া এবং সুললিত ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া নরনারী দলে দলে নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষা করিতেন না, মণ্ডলীর নিকট হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। তিনি স্বহস্তে তাম্বু নির্ম্মাণ করিতেন। সেই অর্থ হইতে নিজের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ মণ্ডলীর উপকারার্থে দান করিতেন। মহাত্মা পল চিরকুমার ছিলেন।

তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া কতবার সমুদ্রপথে জলমগ্ন হইয়াছেন, বিরোধিগণ কতবার তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছে, কতবার প্রাণবিনাশকর ঘটনা তাঁহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অদম্য হৃদয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। তিনি নির্যাতন ও সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করিয়াছেন। পরমেশ্বরের সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সেই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে করিতে, রোমসম্রাট নরপিশাচ নিরোর আদেশে ৬৫ খৃষ্টাব্দে ঘাতক হস্তে এই মহাত্মা মর্ত্ত্য-লীলা সংবরণ করেন।

ঘাসী দাস।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশগড় অবস্থিত। ছত্রিশগড় গিরি দুর্গময় স্থান। তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চকায় পর্ব্বত-প্রাচীর।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন অজেয়শৈলশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সমর-দৃপ্ত মুসলমানগণ ভারতের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতি-রক্ষিত ছত্রিশগড়ের গিরিরাজি, দুর্জ্জয়-ইসলাম-অনীকিনীর প্রবলগতিও প্রতিরোধ করিয়াছে। ছত্রিশগড় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও কোনও বিদেশীয় শাসনের অধীন হয় নাই। এই জন্যই প্রাচীনকালের ধর্ম্ম ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ-রূপে তত্রত্য সমাজের উপর রাজত্ব করিতেছিল।

ছত্রিশগড়ের আয়তন সহস্রাধিক বর্গক্রোশ। অধিবাসি-গণ সকলেই হিন্দু। তাহার এক চতুর্থাংশ চর্ম্মকার জাতীয় লোক। কিন্তু এই চর্ম্মকারগণ পাদুকা নির্ম্মাণ বা চর্ম্মের ব্যবসায় করে না, কৃষিকার্য্যই ইহাদের উপজীব্য। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ এই চর্ম্মকার জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা ও নির্যাতন করিতেন। তাঁহারা চর্ম্মকার গৃহে গমন, তাহাদের সহিত সদ্ভাবে বাক্যালাপ বা সদয় ব্যবহার করিতেন না, এমন কি চর্ম্মকারগণের ছায়াস্পর্শ করাও পাপ বলিয়া মনে করিতেন। চর্ম্মকারগণ লেখা পড়া জানিত না। শাস্ত্রপাঠে যাহাদের অধি-কার নাই, তাহারা কোন্ বিদ্যাশিক্ষা করিবে? সুতরাং তাহাদের অন্ধকারময় জীবনে একটি আলোকরশ্মি প্রকাশিত হইবার কোনও পন্থাই ছিল না। একদিকে উচ্চশ্রেণীকর্ত্তৃক নির্যাতন, অপর দিকে কোনও প্রকার ধর্ম্মালোচনা, বা জ্ঞানালো-চনার অভাব নিবন্ধন অজ্ঞানতা,—এই দ্বিবিধ কারণে তাহারা অন্তরে বাহিরে অতি হীনভাবে জীবন যাপন করিতেছিল।

করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারা যায়, চর্ম্মকারগণের হৃদয় মধ্যে প্রবলরূপে এই চিন্তার উদয় হইল। বিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠগণ সদুপায় নির্দ্ধারণেরজন্য স্থানে স্থানে সম্মিলিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলের মুখেই এক কথা—"দৈব বল ভিন্ন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের আশা নাই।" দৈব বল কি রূপে লাভ হইবে?

এই সময় এক নবীন যুবক তাহাদের আশারক্ষেত্রে উদিত হইলেন। যুবক অতি সুশ্রী, মিষ্টভাষী এবং ধর্ম্মপিপাসু। তাঁহার অন্তরবাহির সৌন্দর্য্যময়। যুবক এরূপ আশ্চর্য্য শক্তিশালী পুরুষ যে, অল্পকালের মধ্যে চর্ম্মকারজাতীয় নরনারী সকলে তাঁহার বশীভূত হইল। সকলেরই এরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, ইঁহার দ্বারা চর্ম্মকার কুলের দুঃখ রজনীর অবসান হইবে। এই যুবকের নাম ঘাসী দাস। ঘাসী দাস ১১৮৭ বঙ্গাব্দে ছত্রিশ গড়ে এক গরিব চর্ম্মকারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।* ঘাসী দাস স্বজাতীয়দিগকে কহিলেন,—"যিনি আমাদিগকে এই পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ভিন্ন এই মনোবেদনা আর আর কাহাকে জানাইব? কেই বা আমাদের কথা শুনিবেন? কিন্তু ভাই সকল, ব্যাকুল ভাবে না ডাকিলে তিনি কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। আমি এই ব্রত সাধনের জন্য দেহ মন অর্পণ করিতেছি। আমি ছয় মাসের জন্য নির্জ্জন স্থানে গমন করিব। তৎপর পুনরায় তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইব, ইহার মধ্যে তোমরা আমার অনুসন্ধান করিও না।"

* ঘাসী দাস রাজা রামমোহন রায়ের ৭ বৎসরের কনিষ্ঠ। ১১৮০ বঙ্গাব্দে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।

চর্ম্মকারগণ ঘাসী দাসকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহার কথা সকলেই শিরোধার্য্য পূর্ব্বক পালন করিত। ঘাসী দাস চর্ম্মকার কুলের স্বাভাবিক নেতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই সাধুসংকল্প অবগত হইয়া চর্ম্মকারগণ বিশেষ আনন্দলাভ করিল। ঘাসী দাস সিদ্ধিলাভ করিয়া চর্ম্মকার জাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবেন, সকলেই ইহা ভাবিয়া পুলকিত হইল।

ঘাসী দাস কতিপয় অনুচরসহ তপস্যায় যাত্রা করিলেন। তিনি জঙ্ক ও মহানদীর সঙ্গম-স্থান-সন্নিহিত গারোধগ্রামে উপস্থিত হইয়া সহযাত্রী দিগকে কহিলেন,—"তোমরা এখান হইতে গৃহে গমন কর। আমি এখন একাকী নিবিড়অরণ্যে প্রবেশ করিব। ছয়মাস পূর্ণ হইলে তোমরা এস্থানে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইবে।" অগত্যা অনুবর্ত্তিগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ঘাসী দাস ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। তিনি এপর্য্যন্ত কোনও প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, কাহারও প্রতি অভ্রান্ত গুরু রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সরল বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহার প্রাণে অন্য কোনও ভাব উদিতই হয় নাই। সুতরাং তিনি সাধন সম্বন্ধে কোনও প্রণালীই অবলম্বন করেন নাই। ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁহার এক মাত্র সম্বল। কিন্তু ভক্ত বৎসল ভগবান মানবপ্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ দেখিয়াই ফলবিধান করেন, অনুরাগ বিহীন সুললিত বাক্য কিম্বা কৃচ্ছসাধন বা বাহ্যিক কোনও কার্য্য দেখিয়া বিধাতা প্রকৃত পুরস্কার দান করেন না।

মাতাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া শিশু যেমন মা মা বলিয়া অবিশ্রান্ত ডাকিতে থাকে, যতক্ষণ মা উপস্থিত না হন, ততক্ষণ সে নীরব হয় না, ঘাসী দাসও তেমন ভাবে অবিশ্রান্ত ডাকিতে লাগিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান সন্তানের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ঘাসী দাস একমাত্র নিরাকার চিন্ময় দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয়মাস অতীত হইল। চর্ম্মকারগণ নিরূপিত দিবসে ঘাসী দাসের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় গারোধগ্রামে দলে দলে উপস্থিত হইল। লোকসমাগমে গ্রাম পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই পার্ব্বতীয় পথের দিকে সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি করিতেছে। এমন সময় দিব্যমূর্ত্তি ঘাসী দাস যোগযুক্তচিত্তে ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। অমনি সহস্রকণ্ঠ হইতে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। ঘাসী দাস উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে সপ্রেম মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়া স্বীয় তপস্যালব্ধ ফল এইরূপে বর্ণন করিলেন,—"ভাই সকল, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও বিধাতা যে অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি চামারদিগেরও অধিদেবতা। তিনি নাম রূপ বর্জ্জিত। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয় না। প্রত্যুত তাঁহার প্রতিমা নাই; তিনি অপ্রতিম—নিরাকার। তিনি সকলেরই নমস্য; নত মস্তকে ভক্তি ভাবে সকলেই তাঁহার শরণাগত হও।" তিনি ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, এসকল কথা স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছেন, এবং এই নবধর্ম্ম বিশেষভাবে চর্ম্মকারদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন ও আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। এই আচার্য্যত্ব তাঁহার বংশানুগত থাকিবে।

ঘাসী দাস প্রচারিত-ধর্ম্ম ছত্রিশগড়ের চর্ম্মকার জাতীয় সকল নরনারী সাদরে গ্রহণ করিল। তিনি চামার কুলের মধ্যে ধর্ম্মেরএরূপ প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, তাহাদের মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, আলস্য জড়তা ও অজ্ঞানতা দিন দিন দূরীভূত হইতে লাগিল। ধর্ম্মের এমনই শক্তি যে, তাহাতে অসম্ভব কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা পিপীলিকার ন্যায় পদ-দলিত হইত, যাহাদের দণ্ডায়মান হইবার কোনও নিরাপদ ভূমি ছিল না, যাহারা ধর্ম্ম-বিহীন, সাধনভজনবিহীন হইয়া অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, তাহারা নবউদ্যমে ও নবউৎসাহে উৎসাহিত এবং নববলে সঞ্জীবিত হইয়া নূতন জাতিতে পরিণত হইল। ধর্ম্মই মানবকে সর্ব্ব প্রকার উন্নতির রাজ্যে লইয়া যায়। ধর্ম্মবিহীন মানবসমাজ মৃত, পতিত, চলচ্ছক্তিবিহীন এবং কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় অস্পৃশ্য।

এতদিন পরে ছত্রিশগড়ের চর্ম্মকারগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নীচ দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আকাশ বিহারী প্রমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় ভগবানের সচ্চিদানন্দময় ধর্ম্মরাজ্যের সুশীতল ছায়ায় বিচরণ করিতে লাগিল। ঘাসী দাস নবধর্ম্ম ও নবধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কোনও নূতন আখ্যা প্রদান করেন নাই, ইহারা সাধারণের নিকট "সৎ-নামী" বলিয়া পরিচিত। কবির পন্থিদিগের এক শাখাও "সৎ-নামী" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, ইহারা সেই "সৎ-নামী" নহে।

ঘাসী দাস লেখা পড়া জানিতেন না, তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান ছিল না, কাহারও নিকট তিনি উপদেশও গ্রহণ করেন নাই, কোনও মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই; তিনি স্বভাব-শিশুর ন্যায় প্রেমে-

শ্বরকে ডাকিয়াছিলেন, স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন। নিরক্ষর শাস্ত্র জ্ঞানহীন লোকেও যে একমাত্র নিরাকার পূর্ণব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বিবেক কর্ণে তাঁহার প্রত্যাদেশ বাণী শ্রবণ করিতে পারেন, মহাত্মা ঘাসী দাসের পবিত্র জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

নববধূ।

জালালপুর গ্রামে দেবকী নন্দন আঢ্য নামে একজন ধনবান সওদাগর বাস করিতেন। তিনি প্রথমে মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে কাটোয়া বিভাগে ফৌজদারের কার্য্য করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার সুরম্য-হর্ম্ম্যরাজি-শোভিত-সুদৃশ্য-ভবন গঙ্গাতীরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। প্রতি অমাবস্যার নিশীথে তিনি মহাসমারোহে পূজা করিতেন। কপালে রক্ত চন্দনের ফোটা, গলায় মহাশঙ্খের মালা এবং পরিধানে রক্ত বস্ত্র,—এরূপে তান্ত্রিক বেশে সজ্জিত হইয়া মহাপাত্রে সুরাপান করিতেন। মদ্য মাংস ও অন্যান্য তান্ত্রিক উপকরণ দ্বারা ষোড়শোপচারে তিনি শাক্তধর্ম্ম সাধন করিতেন।

দেবকী নন্দন এই রূপে বীরাচার ধর্ম্ম সাধন করিতেছিলেন, হঠাৎ একটি শিশু পুত্র রাখিয়া তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করিলেন। এতদ্দেশের ধনবানদিগের পত্নী বিয়োগ হইলে শ্রাদ্ধ ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবকীনন্দনেরও তাহাই হইল। অল্প দিনের মধ্যেই নববধূ গৃহে সমাগতা হইলেন।

নববধূ বৈষ্ণব গৃহস্থের কন্যা। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে একান্ত ভক্তিমতি। সর্ব্বদা হরিনাম যপ করেন, নিরামিষ আহার করেন এবং সাধু-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। বিবাহের পর তিনি স্বামী গৃহে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

"আসিয়ে দেখয়ে সব বিপর্য্যয় ভাব।
তমোগুণ ময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব॥
রক্ত চন্দন অঙ্গে জবা পুষ্প মাল।
হুম্ হুম্ করি চলে দেখিতে করাল॥
কাটা ছেঁড়া মদ্য মাংস সদা ব্যবহার।
যোগিণী চক্রেতে বসি করয়ে আহার॥"

ভক্ত মাল।

নববধূ ভাবিতে লাগিলেন, "মদ্য মাংস আহারে, পশুবধে, নানা রূপ কুব্যবহারে যাঁহার হৃদয় মন মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়াছে, সেই কি আমার স্বামী? এই কি আমার শ্বশুর বাড়ী, যেখানে হরিকথা কেহই বলেন না? আমাকে কি এই নরককুণ্ডে চিরজীবন বাস করিতে হইবে? হায় পিতা মাতা আমাকে কেন এমন স্থানে বিবাহ দিলেন! এই নরকে বাস করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়। যেখানে হরিভক্তি নাই, ধর্ম্ম বিশ্বাস নাই, যেখানে ধর্ম্মের নামে কেবল পশ্বাচার, এমন স্থলে কি রূপে বাস করিব?"

নববধূ অস্থির হইলেন। পিত্রালয় হইতে সঙ্গে যে দাসী আসিয়াছিল, তাহাকে কহিলেন;—"এখনই ফিরিয়া বাড়ী চল, আমি এমন কুস্থানে এক দণ্ডও বাস করিব না। এখানে

থাকিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। আমি ইহাদের জলস্পর্শ করিব না। তুমি যদি আমাকে বাড়ী লইয়া না যাও, তবে হয়ত আত্মহত্যা করিব।” এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দাসী নানা মতে প্রবোধ দিল; কিন্তু কিছুতেই তিনি সুস্থির হইলেন না। নববধূকে দেখিবার জন্য প্রতিবেসিগণ আসিয়া একত্র হইল। ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাহারা ভাবিল যে, পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া বধূ কাঁদিতেছেন। নবাগতা ক্রন্দননিরতা বধূকে যে প্রকারে মিষ্ট-বচনে প্রবোধ দিতে হয়, প্রতিবেসিগণ সেরূপ সুমধুর বচনে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল। শ্বশ্রূঠাকুরাণী বধূকে আহার করিবার জন্য কত বলিলেন, বধূ কাহারও কথার উত্তর দিলেন না, কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভোজনও করেন না, ক্রন্দনও নিবারণ হয় না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। বধূর এরূপ অবস্থা দেখিয়া স্বামী-গৃহের সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তখন দাসী তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া নানা প্রকারে মিনতি করিয়া আহার করিতে বলিল। অগত্যা বধূ কহিলেন—“আমি নিজহস্তে রাঁধিয়া খাইতে পারি। যাহারা নানারূপে অত্যাচার করে, অভক্ষ্য ভোজন করে, তাহাদের হাতের অন্ন খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষ আমি নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকি।” এই কথা শুনিয়া সকলে প্রথমে বিদ্রূপ করিল বটে; কিন্তু তিন দিনের উপবাসের পর আহার না করিলে বিপদ ঘটিবে ভাবিয়া অগত্যা শ্বশ্রূ, বধূর প্রস্তাবেই সম্মতি দান করিলেন। বধূ স্বহস্তে নিরামিষ রন্ধন করিলেন এবং ইষ্ট-দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া ভোজন করিলেন।

এইরূপে প্রতিদিন তিনি আহারসামগ্রী নিজহস্তে প্রস্তুত করিতেন। অপর দিকে স্বামীকে পাশবিক আচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অমৃত কথা বলিতেন। হরিগতপ্রাণা সাধ্বীপত্নীর ধর্ম্মনিষ্ঠজীবন দেখিয়া কঠোর-হৃদয় দেবকীনন্দনের প্রাণ দিন দিন বৈষ্ণবধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শাক্তহৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবের অভ্যুদয় হইল। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তিনি পত্নীর দেব-চরিত্র দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেবকীনন্দনের পূর্ব্ব পক্ষের পুত্রটীর মৃত্যু হইল। দেবকীনন্দন পুত্রশোকে অস্থির হইলেন। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবীপত্নী অটল শান্তভাবে রহিলেন। স্বপত্নী-সন্তান বলিয়া যে তাঁহার শোকোদয় হয় নাই, তাহা নহে, স্বপত্নীসন্তানের প্রতি নিজ সন্তানের ন্যায় তাঁহার বাৎসল্য ছিল। স্বপত্নী-সন্তান কেন, তিনি পরের সন্তানকেও স্বসন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রেম পরিবারের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল না। তিনি ভগবানকে প্রেমময় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এজন্যই শোক ও দুঃখের অতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে যোগযুক্ত হইয়া শোক-দগ্ধ উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত স্বামীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বিষাদের ঘন অন্ধকার মধ্যে পত্নীর স্থির ও প্রশান্ত আলোকময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া দেবকীনন্দনের চিত্ত মোহিত হইল। পত্নীকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিলেন। দিন দিন সেই দেবীচরিত্রের প্রভাবে তিনি শাক্তধর্ম্মের ভীষণ আচরণ সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে শক্তি-সাধন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ

করিলেন। সুরা, মাংস, কু-আচার বর্জ্জন করিয়া পরমবৈষ্ণব হইলেন। ধন্য সেই রমণী, যিনি স্বীয় ধর্ম্মবলে এইরূপে স্বামীকুলের হৃদয়পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। সেই গৃহ ধন্য, যে গৃহে এইরূপ ধর্ম্মানুরাগিণী অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ নববধূ সমাগতা হন এবং ধন্য সেই ধর্ম্মসমাজ, যে সমাজে অশিক্ষিতা অপরিণতবয়স্কা বালিকার প্রাণেও ধর্ম্মের এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হয়।

কুকা-গুরু রাম সিংহ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিস্‌গবর্ণমেণ্টের কোনও দেশীয় পদাতিক সৈন্যদল পশ্চিম ভারতবর্ষের এক পর্ব্বত-চত্বরে অবস্থিতি করিতেছিল। অনতিদূরে শৈলবাহিনী-স্রোতস্বতী অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। তীরদেশ শ্যামল উদ্ভিজ্জে অতি স্নিগ্ধ। সন্ধ্যার সুকোমল-চ্ছায়া সমাগমে এই স্থান পরম-রমণীর বেশ ধারণ করিত। প্রাকৃতিক শোভা এবং মূর্ত্তিমতী নিস্তব্ধতায় এস্থান ভগবদারাধনার অতীব অনুকূল দেখিয়া, সৈন্য দলস্থ একজন নিম্নশ্রেণীর সৈনিক প্রতিদিন অপরাহ্নে এই স্থানে গমন করিতেন এবং দূর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরমেশ্বরের ধ্যানে আত্ম-সমাধান করিতেন। এই যুবকের নাম রাম সিংহ।

মহাত্মা নানক, পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে যে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ সিংহের অতুলনীয় শক্তি পরিচালিত

বৃক্ষরূপ শিখধর্ম্ম অভ্যুদিত হয়, রামসিংহ সেই একেশ্বর-বাদের লীলাভূমি পঞ্চনদের শিখ-সমাজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া নানা দেশ ভ্রমণের পর, প্রকৃতির রম্যকানন পূর্ব্ববর্ণিতস্থানে উপস্থিত হইয়া গভীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন বহুক্ষণব্যাপী ধ্যান করিতেন। গভীর ধ্যানের সময় তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইত, আয়ত-মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ হইত এবং ভক্তিতে হৃদয় এরূপ উদ্বেলিত হইত যে, মুখ হইতে একপ্রকার অস্ফুটধ্বনি, ("কু—কু" শব্দ) বাহির হইত। এই "কু—কু" শব্দ হইতেই তিনি "কুকা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

ক্রমে রেজিমেণ্টের অন্যান্য দুই একজন সিপাহীও রাম-সিংহের সঙ্গে নির্জ্জনে গিয়া সাধন করিতে লাগিল। যখন রামসিংহ বিশেষরূপে সাধন ভজনের জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন তিনি সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে গমন করিলেন, এবং সম-সাধকদিগকে লইয়া মণ্ডলী গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। রামসিংহের দেবচরিত্রের এরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে, যাহারা তাঁহার সঙ্গে সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য দেশে সাধন ভজন করিতে যাইতেন, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ সৈনিককর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশেষসাধনে প্রবৃত্ত হইল। স্পর্শমণির সহযোগে যেমন লৌহখণ্ডও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মোন্মত্ত রামসিংহের সঙ্গলাভ করিয়া, বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কঠোরহৃদয় সিপাহীগণও শান্তি লাভের আশায় ধর্ম্মের সুশীতল আশ্রয় অবলম্বন করিল।

রামসিংহ স্বীয় জন্মভূমি পঞ্চনদক্ষেত্রে বাস করিয়া শিখ

জাতির মধ্যে এক নবশক্তি সঞ্চারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু গোবিন্দের ন্যায় উপযুক্ত কাণ্ডারীর অভাবে মহাত্মা নানকের ধর্ম্মসম্প্রদায় রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় দিন দিন ম্লান হইতেছে ; নানা প্রকার কুসংস্কার ও পাপে শিখধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়াছে, মুসলমান-বিজয়ী ইংরাজ-ত্রাস শিখগণ ভীরু ফেরুপালের ন্যায় যুথভ্রষ্ট, ছিন্ন ভিন্ন। এমন সময়ে শিখসমাজরূপ মৃতদেহে নবজীবন দান করিবার জন্য স্বর্গের অমৃতবারি হস্তে গ্রহণ করিয়া মহাত্মা রামসিংহ উপস্থিত হইলেন। তিনি নানকের একেশ্বরবাদ-মহাধর্ম্ম, মন্ত্রপুত করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

যখন সাধু ভক্তগণ ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন, তখন জনসমাজ সেই ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। যোগ-জীবন শাক্য সিংহ, বিশ্বাসী যীশু ও মহম্মদ, এবং প্রেমিক চৈতন্যদেবের পতাকামূলে দলে দলে কেন এতলোক একত্র হইয়াছিল ? তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা কাহাকেও আহ্বান করিয়া স্বকপোলকল্পিত কথা প্রচার করেন নাই ; প্রভু পরমেশ্বরের আদেশবাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামসিংহও এই শ্রেণীর প্রচারক ছিলেন। সুতরাং অপ্রতিহতপ্রভাবে দিন দিন তাঁহার একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল।

দলবৃদ্ধিতেই যে উন্নতি অবনতি প্রমাণিত হয়, তাহা নহে। নন্দনকাননসদৃশ ইয়ুরোপভূমিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার জন্য নেপোলিয়ান কত বড় দলই গঠন করিয়াছিলেন,

বিন্দুর ন্যায় অগণ্য ছিল। এইরূপ দল বৃদ্ধিই কি মানবের সৌভাগ্য বা শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক? যেরূপ দলে প্রবেশ লাভ করিলে মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; মানবের বিষয়াসক্তি, স্বার্থপরতা, কপটতা দূরীভূত হয়; প্রেম ও ভক্তি বিকশিত হইয়া মানবের হৃদয়ে নবসৌন্দর্য্যের-সমাবেশ হয়, সেইরূপ দলের বৃদ্ধিতেই দেবতাগণ, ঋষিগণ, সাধু-গণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন।*

রামসিংহের দল শেষোক্ত প্রকারের। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া লোকের হৃদয় কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইত তৎসম্বন্ধীয় দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে।

একজন শিখ, কুকা-মণ্ডলী-ভুক্ত হইবার বহুদিন পূর্ব্বে অপরের একটি গাভী অপহরণ করিয়াছিলেন। তিনি রামসিংহের সংসর্গে আসিয়া যখন ধর্ম্মজীবন লাভ করিলেন, তখন সেই পূর্ব্বকৃত গাভীহরণের কথা স্মরণ করিয়া ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তাঁহারে সুনিদ্রা হয় না, সাধন ভজনেও মন নিবিষ্ট হয় না, অনুতাপের তীব্রযন্ত্রণা, বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণাবৎ

---

* মহা নির্ব্বাণতন্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে ;—

ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে॥
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ।
গায়ন্তি গায়নীং গাথাং পুলকাঙ্কিত বিগ্রহাঃ॥
অস্মৎ কুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়া পিণ্ডৈঃ কিং তীর্থ শ্রাদ্ধ তর্পণৈঃ॥

তৃতীয় উল্লাস।

"হে শিবে, তাঁহার পিতা মাতা ধন্য হন, এবং কুল পবিত্র হয়। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণসহ আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহারা পুলকিত দেহে এই গাথা গান করেন,—"আমাদের কুলে কুলশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপদেষ্টা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের গয়া পিণ্ডে প্রয়োজন কি? তীর্থ ও শ্রাদ্ধ

তাঁহার হৃদয় মনকে অস্থির করিয়া তুলিল! তিনি কোনও প্রকারে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে একদিন পোলিশ কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া যথোচিত দণ্ড গ্রহণ করিলেন।

অপর একজন শিখ পূর্ব্বজীবনে ভ্রাতার সঙ্গে পৃথক হইবার সময় অন্যায়পূর্ব্বক নিজঅংশে অধিক সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামসিংহের শিষ্য হওয়ার পর তিনি সেই অন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করেন, এবং তাঁহার চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কোনও গ্রামে একজন ভয়ানক দুরন্ত লোক ছিল। সুরাপান, ব্যভিচার, চুরী, দস্যুতা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। গ্রামের লোকে অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলিত যে,—"শুনিয়াছি, রামসিংহের দলে গেলে না কি মানুষ ভাল হইয়া যায়। এ লোকটা যদি তাঁহার কাছে যাইত, তাহা হইলে আমরা রক্ষা পাইতাম।" কিয়দ্দিন পরে তাহাই হইল। সেই দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোকটি রামসিংহের শরণাগত হইয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে, সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

রামসিংহের দেবচরিত্রের প্রভাবে এরূপে বহু লোকের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রামসিংহের চরিত্র-প্রভাব শিষ্যগণের মধ্যে এরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল যে, তাঁহার ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র শিষ্য যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইত। ঈশ্বর-বিশ্বাসী আবুবেকার ওমর প্রভৃতি মহম্মদের শিষ্যগণ যেমন মহম্মদের জন্য

শিষ্যগণও তদ্রূপ গুরুগতপ্রাণ হইয়া উঠিল, তাহারা পরস্পর ছুশ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইল। সহানুভূতি, প্রেম, এবং সমসাধনাতে দলস্থ সকলে একীভূত হইয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবাময়জীবন কুকাসম্প্রদায় এক অজেয় আধ্যাত্মিকশক্তি ধারণ করিল। মহাপ্রতাপান্বিত সম্রাট যাহা করিতে অসমর্থ, বিদ্বান পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, ধনবল বা জনবল প্রয়োগে যাহা লাভ হয় না, দরিদ্র, অশিক্ষিত, পার্থিবসহায়বর্জ্জিত রামসিংহ সেই কার্য্য সাধনে সিদ্ধ হইলেন। মানব মনের উপর তিনি প্রেমের-রাজত্ব স্থাপন করিলেন। অন্ধকারপথে বিভ্রান্ত মানবকে তিনি করে ধরিয়া সুপথে লইয়া যাইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অঙ্গুলী-সঙ্কেতের অধীন হইল। শিখ-সমাজে এক নূতনযুগের সূত্রপাত হইল।

সমরপ্রিয় শিখজগতে গুরুগোবিন্দের তুল্য তেজস্বী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অধিনায়কস্বরূপ সমুপস্থিত দেখিয়া ব্রিটিস সিংহের হৃদয় আতঙ্কিত হইল। সহস্র সহস্র দুর্জ্জয় শিখবীর যাঁহার অনুজ্ঞায় জীবন দান করিতে প্রস্তুত, শিখজাতির মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ, এরূপ মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে বিদেশীয়,বিজাতীয় রাজপুরুষগণ যে শঙ্কিত হইবেন,তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গবর্ণমেণ্টের এই অসঙ্গত সন্দেহ নিবা-রণের জন্য মহাত্মা রামসিংহ না কি একবার জনৈক উচ্চ-রাজপুরুষকে বলিয়াছিলেন,—"আমাকে আপনারা অযথা সন্দেহ করিতেছেন। অশান্তি আনয়ন করা,নরশোণিতপাত করা,আমার উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম্মসাধন দ্বারা জনসমাজকে উন্নত করা, পর-

মেশ্বরের দিকে স্বদেশীয়দিগকে অগ্রসর করাই আমার লক্ষ্য।”

এই সময়ের একটি ঘটনায় গবর্ণমেণ্টের আতঙ্ক আরও বর্দ্ধিত হইল। ঘটনাটি এই ;—লাহোর বা অমৃতসরের মুসলমান কসাইদিগের সহিত গোবধ লইয়া হিন্দুদিগের মনোবাদ হয়। কসাইগণ হিন্দুপল্লী দিয়া গোমাংস লইয়া যাইত এবং হিন্দুদিগকে ক্রয় করিবার জন্য বলিত। ইহাতে হিন্দুগণ মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করে। হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, কসাইগণ ছিন্নশির হইয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে শায়িত রহিয়াছে। সহরে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। পোলিশ প্রাণপণে হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল ; কিন্তু সাধারণপোলিশ কোনও মতেই অপরাধীকে ধৃত করিতে পারিল না। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একজন অতি সুদক্ষ ইংরাজ পোলিশ কর্ম্মচারীর প্রতি অনুসন্ধানের ভারার্পণ করিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অসাধারণ কার্য্যকুশলতার বলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই হত্যাকারীদিগকে ধৃত করিয়া বিচারার্থে অর্পণ করিলেন। বিচারক সেই অপরাধীগণের প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলেন। এই সময় বিচারালয়ে কয়েকজন শিখ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “ধর্ম্মাবতার! নিরাপরাধ লোকদিগকে ফাঁসি দিবেন না। কসাইদিগকে আমরা হত্যা করিয়াছি। আমরা অপরাধ স্বীকার করিতাম না; কিন্তু যখন দেখিতেছি, আমাদের অপরাধের জন্য কয়েক জন নিরপরাধলোক বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমরা লুকায়িত থাকিয়া আত্মরক্ষা করা নিতান্ত অধর্ম্মের কার্য্য মনে করিতেছি।” আত্মসমর্পণকারি-

দেখিয়া বিচারালয়ের সকলে স্তম্ভিত, এবং বিচারক অপ্রতিভ হইলেন। ইঁহারা কুকা, রামসিংহের শিষ্য। বলা বাহুল্য বিচারক ইঁহাদিগেরই প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলেন।

এইরূপ জনরব যে, সেই দিন হইতে গবর্ণমেণ্ট রামসিংহের দল ভগ্ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রামসিংহের দোষ কি? বোধ হয় রামসিংহের ইহাই অপরাধ যে, তাঁহার শিষ্যগণ একতাপরায়ণ, সাহসী এবং অনুগত ছিল। অল্প লোকে মিলিত হইয়া যাহারা কসাইদিগকে হত্যা করিয়াছে, বহু লোকে মিলিত হইলে যে, তাহারা ভয়ানক কাণ্ড করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? অতএব এই একতার মালা সম্পূর্ণ গ্রথিত হইবার পূর্ব্বেই সূত্র ছিন্ন করা কর্ত্তব্য। সম্ভবত আভ্যন্তরিক এই সকল গূঢ় কারণেই রামসিংহ চিরনির্ব্বাসিত হইলেন। সুদূর রেঙ্গুণের কারাগৃহ তাঁহার বাসগৃহ হইল। যেখানে চোর, দস্যু, নরহন্তাগণ বাসকরে, মহাত্মা রামসিংহ তাহাদের মধ্যে অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। শিষ্যগণের হাহাকার ধ্বনিতে পঞ্চনদ পূর্ণ হইল। পক্ষী-মাতা স্বীয় পক্ষপুটের আচ্ছাদনে শাবকদিগকে রক্ষা করিতে ছিলেন, অকস্মাৎ ব্যাধ আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, শাবকগণ মাতৃহীন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল! নবোদিত সূর্য্যের আলোকে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হইতেছিল, সেই নব কিরণে মৃত শুষ্ক শিখতরু মঞ্জুরিত হইতেছিল, অকস্মাৎ কালমেঘ আসিয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল! কুকা নরনারীগণ অন্ধকারে রোদন করিতে

রামসিংহ কারাগারে গমন করিয়াও রামসিংহই রহিলেন। কারাবাসিগণ তাঁহার দৈবশক্তির প্রভাবে বিমোহিত হইল। তিনি কারাগারের গুরু হইলেন। কেহ কেহ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কারাগারেই ধর্ম্ম সাধন করিতে লাগিল। চোর, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বন্দিগণ সাধুপথ আশ্রয় করিতে লাগিল। ধর্ম্মালোচনা, সাধন ভজন এবং সংগীতাদিতে কারাবাসিগণের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রামসিংহের আগমনে কারাগার স্বর্গে পরিণত হইতে চলিল! তিনি যখন যাহাকে যে আদেশ করিতেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। তিনি মনোরাজ্যের রাজা রূপে সম্পূজিত হইতে লাগিলেন।

রামসিংহ এমন কি-এক মহাশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে গমন করিতেন, যে অবস্থাতে বাস করিতেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভুত্ব? তাঁহার মধ্যে কি অমৃত ছিল যে, সংসার মৃগতৃষ্ণায় তৃষিতমানব মধুকরের ন্যায় নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহাতে গিয়া মজিয়া থাকিত? কোন্ শক্তিবলে, চুম্বক-প্রস্তর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি সেইরূপ মানবমন আকর্ষণ করিতেন? ঐ শক্তিই ব্রহ্মশক্তি! তিনি অজেয় ব্রহ্মশক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন! যে শক্তির বলে মৎস্যধৃতকারী জালজীবি এবং পিতৃ অন্তেষ্টিক্রিয়া-রত-পুত্র, মহাত্মা যীশুর অনুবর্ত্তী হইয়াছিল; যে শক্তির আকর্ষণে শাক্যসিংহ ও মহম্মদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পঙ্গপালের ন্যায় মানবমণ্ডলী ধাবিত হইত, যে শক্তিতে পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া থাকে, মহাত্মা রামসিংহ সেই

তিনি নির্ব্বাসিত না হইলে, কে জানিত যে, শিখসমাজ ভিন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করিত না? মহাত্মা রামসিংহ রেঙ্গুনের কারাগারেই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর বিচারের অতীত স্থানে গমন করিয়াছেন।

ঋষি ও আলেক্জেণ্ডার।

গ্রীকবীর আলেকজেণ্ডার বা সেকেন্দর সাহ ভারতসমরে জয়লাভ করিয়া * ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌগলিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এতদ্দেশে "ঋষি" নামক ধ্যানপরায়ণ এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া পর্ব্বত-গুহা বা নির্জ্জন অরণ্যে—লোক চক্ষুর অগোচরে বাস করিয়া ঈশ্বর-সাধনায় সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন। এইরূপ কোনও ঋষিকে দেখিবার জন্য আলেকজেণ্ডার আগ্রহান্বিত হইলেন। তিনি শ্রুতিপরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, অদূরে অরণ্য-মধ্যে দন্দমীশ্ নামক একজন ঋষি বাস করিতেছেন। আলেকজেণ্ডার স্বীয় অনুচর ওনিসিক্রতাস্ নামক দার্শনিক পণ্ডিতকে উক্ত ঋষিকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

ওনিসিক্রতাস্ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গ্রীক-রাজ-কর্ম্মচারী-সুলভ গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন,—"জুপিটর দেবের পুত্র, সমগ্রমানবমণ্ডলীর ঈশ্বর, আপনাকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

আপনি রাজসমীপে উপস্থিত হইলে যথোচিত ধন রত্ন পাইবেন। উপস্থিত না হইলে, আপনার শিরোচ্ছেদ হইবে।"*

জনৈক দ্বিভাষী ওনিসিক্রতাসের এই সকল কথা ঋষিকে বুঝাইয়া দিলেন। ঋষিপ্রবর ওনিসিক্রতাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, —"আলেকজেণ্ডার কি জন্য এত দূর আসিয়াছেন?" ঋষির শান্তোজ্জ্বলকটাক্ষপাত এবং বাক্যের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া ওনিসিক্রতাস্ স্তম্ভিত হইলেন।

ঋষি বলিলেন,* "জগতপতি জগদীশ্বর অমঙ্গলের নিদান নহেন,—তিনি তেজ, জল, দেহ, জীবন এবং আত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন মৃত্যু এই সকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তখন তিনি তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি কোনও রূপ অমঙ্গল বাঞ্ছা করেন না। সেই এক মাত্র সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার ঈশ্বর। তিনি কোনও জীবকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন না। কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্র জীব-রুধিরে প্লাবিত করেন না!"

"আলেকজেণ্ডার জরা মৃত্যুর অধীন, এক জন সামান্য মনুষ্য। তিনি এখন পর্য্যন্ত এই পৃথিবীকেই এক ছত্রের অধীন করিতে পারেন নাই। ঐ দেখ, আকাশে অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমান রহিয়াছে, যে স্থানে আলেকজেণ্ডারের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই। তিনি "সমগ্র মানবমণ্ডলীর ঈশ্বর" এই অনৃতবাক্য তাঁহার অনুগত স্তুতিপরায়ণ লোকের মুখেই শোভা পায়!"

"আলেকজেণ্ডার আমাকে যে সকল বস্তু দিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। জীবন ধারণ জন্য

আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা এই গৃহের চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। আলেকজেণ্ডার আমাকে যে সকল দ্রব্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন, সেই সকল বস্তু লইয়া তিনিই তৃপ্তিলাভ করুন। বনে ফল ও কন্দমূল আছে, স্রোতস্বতীতে সুনির্ম্মল পানীয় আছে, আমার কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় আমাকে সকল যোগাইতেছেন। আমি যথেচ্ছ বিচরণ করি। এ জগতে এমন কোনওবস্তু নাই, যাহাতে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইয়া যাইতে পারে।”

“আমি আলেকজেণ্ডারের আদেশ প্রতিপালন করিলাম না বলিয়া, তিনি যদি আমার মস্তক-চ্ছেদন করেন, তাহাতেই বা দুঃখ কি? মৃত্যু ত এক দিন হইবেই। অসার শরীর ধ্বংশ হইবে; কিন্তু অবিনাশী আত্মার ধ্বংশ নাই। আমার জিহ্বা নীরব হইবে, কিন্তু আমার আত্মা পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় এই মাটির দেহ মাটিতে ফেলিয়া পরব্রহ্মের নিকট গমন করিবে। আমার ক্ষীণ-জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত মিলিত হইবে! যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, কিম্বা ধনরত্নের অভিলাষী, আলেকজেণ্ডার তাহাদিগকে ভয় ও প্রলোভন দেখাইতে পারেন। কিন্তু তাহার অসি এবং ধন আমার কিছুই করিতে পারিবেনা। তুমি আলেকজেণ্ডারকে গিয়া বল,—“দন্দমীশ তোমার নিকট আসিতে প্রস্তুত নহে। তোমার কোনও প্রয়োজন থাকিলে, তুমি তাহার নিকট যাইতে পার। আর ইহাও বলিও, জগদীশ্বরের নিকট অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের বিচার হইবে। উদ্ধতপ্রকৃতি দুর্ব্বৃত্তদিগকে বিচারের সময়

ওনিসিক্রতাস্ ঋষি-মুখ-শ্রুত সমুদয় কথা আলেকজেণ্ডারকে গিয়া বলিলেন। ঋষি আদেশ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে আলেকজেণ্ডারের সাহস হইল না। তিনি স্বয়ং পারিষদবর্গসহ দন্দমীশের তপোবনে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। ঋষিকে গ্রীকদেশে লইয়া যাইবার জন্য আলেকজেণ্ডার অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন; কিন্তু ঋষি ঘৃণার সহিত এই স্বার্থময় প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন।

মহাবীর আলেকজেণ্ডার স্বদেশে আর একজন সাধুর নিকটে এইরূপ অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। সেই সাধুর নাম ডায়োজেনিস্। একদা আলেকজেণ্ডার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কি অভাব আছে বলুন, আলেকজেণ্ডার এখনই তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।" কঠোর সাধন-রত ডায়োজেনিস্ তখন কুটীরের প্রান্তভাগে সূর্য্যালোকে-উপবিষ্ট ছিলেন। আলেকজেণ্ডার তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হওয়াতে, আলোকের গতি রোধ হইয়াছিল। ডায়োজেনিস্ কহিলেন,—"তোমার কাছে আমার অন্য প্রার্থনা কিছুই নাই, কেবল ইহাই প্রার্থনা যে, তুমি একটু সরিয়া দাঁড়াও, আমি নির্ব্বিঘ্নে রৌদ্র উপভোগ করি।"

সমাপ্ত